# হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক
# জানা অজানা

ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

**হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক**
জানা অজানা
**ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ**

**প্রকাশকাল**
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১
তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২

**প্রকাশক**

**প্রচ্ছদ**
শিল্পী ক্লাউড লি লে'র আঁকা ছবি অবলম্বনে

**গ্রন্থ স্বত্ব**
মেধা ঘোষ, নেহা ঘোষ ও দিগ্বিজয় ঘোষ রোহন

**মূল্য**
১০০.০০ টাকা মাত্র

**মুদ্রণ**

**Heart Attack O Stroke**
Jana Ajana
**Dr. Triptish Chandra Ghose**

**Published by**

**Price**
US $ 5.00

**ISBN No** - 984-300-003387-3

# হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক
## জানা অজানা

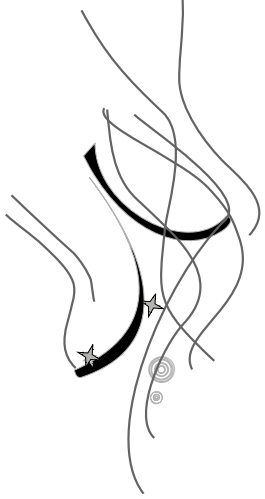

# উৎসর্গ

হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের উদ্দেশ্যে

## ইতোপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ

হৃদরোগের মহামারী ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ

শিশু-কিশোর স্বাস্থ্যকথা (সম্পাদিত)

এবং দ্রোহের আদিম পুরুষ (কাব্যগ্রন্থ)

নারী ও হৃদরোগ

হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে হঠাৎ মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন দুই তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় কোনরকম চিকিৎসা পাওয়া ছাড়াই। আর স্ট্রোকের বেলায় চিত্র আরও ভয়াবহ, স্ট্রোকের রোগীরা আধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার পরও শতকরা ৩০ জন মারা যায় অথবা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়।

হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক - জানা অজানা বইটি গতানুগতিক প্রবন্ধাকারে না লিখে অনুপুংখ বা পয়েন্ট আকারে লেখা হয়েছে। এর প্রতিটি অনুপুংখই একেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করে। আশা করছি বইটি পড়ে পাঠকরা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারবে এবং এর প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বইটির অসম্ভব পাঠক চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রুফ দেখার মত কষ্টকর কাজটি করেছেন আমার মেজদা নীতীশ চন্দ্র ঘোষ। তাঁর কাছে ঋণী।

বইটি প্রকাশনার যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার স্ত্রী ডা. মল্লিকা বিশ্বাস এর অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতা বইটি প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পরিশেষে সকলপ্রকার মুদ্রণ ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে পাঠক বইটি পড়ে বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ

# হার্ট কী ?

- মানুষের হার্ট হচ্ছে একটি মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের সমান মাংসপিন্ড যা বুকের মাঝ থেকে সামান্য বামপাশে অবস্থিত ।
- একটি ভ্রূণ শিশুর শরীরে হার্টই প্রথম অঙ্গ হিসাবে কাজ শুরু করে ।
- হার্টের ওজন এক পাউন্ডেরও কম ।
- সারা শরীরের মধ্যে হার্টের মাংসপেশী সবচেয়ে শক্তিশালী ।
- হার্ট তার ভিতর যথেষ্ট চাপ উৎপাদন করতে সক্ষম যা দিয়ে প্রায় ৩০ ফুট দূরে রক্ত ঠেলে দেয়া সম্ভব ।
- প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সাথে সাথে হার্ট রক্ত পাম্প করে । এই রক্ত অক্সিজেন এবং খাদ্য বহন করে নিয়ে যায় সারা শরীরে ।
- বিশ্রামে থাকা অবস্থায় প্রতি মিনিটে হার্ট প্রায় ৭০ বার স্পন্দিত হয় - যাকে বলে হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন ।
- আমরা হার্ট নিয়ে কোন কিছু চিন্তা করি বা না করি সারাদিনে হার্ট প্রায় একলক্ষ বার স্পন্দিত হয় । আর একজন গড় আয়ুর লোকের ক্ষেত্রে এক জীবনে তিন বিলিয়নেরও বেশী বার হার্টবিট হয়ে থাকে ।
- পরিশ্রম করলে বা আবেগাপ্লুত হলে হার্টবিট বেড়ে যায় ।
- যে রক্তনালীর মাধ্যমে হার্ট তার নিজের জন্য অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহ পায় তাকে বলে করোনারি আর্টারি ।
- হার্টের প্রধান কাজ হলো সঠিক পরিমাণ রক্ত পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয়া, যাকে রক্ত সঞ্চালন বা সার্কুলেশন বলে । এই সঞ্চালিত রক্ত শরীরের টিস্যুগুলোতে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অক্সিজেন পৌঁছে দেয় এবং টিস্যুগুলো থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন করে ।

- হার্ট প্রতিবারে কতটুকু রক্ত পাম্প করবে তা নির্ভর করে শরীরের প্রতি অংশে কতটুকু রক্ত প্রয়োজন তার উপর ।
- সাধারণতঃ আপনি যখন বিশ্রামে থাকেন তখন আপনার শরীরে রক্তের প্রয়োজন কম হয় । আর অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের সময় রক্তের প্রয়োজনও বেড়ে যায় ।
- ব্যায়ামের সময় শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং টিস্যুগুলোতে রক্তের প্রয়োজনীয়তা মেটাতেই হৃদস্পন্দন কখনো দ্রুত বা ধীরে হয় এবং রক্তনালীগুলো প্রয়োজনীয় রক্ত সঞ্চালনের জন্য প্রসারিত কিংবা সংকুচিত হয় ।
- শুধুমাত্র শারীরিক পরিশ্রমের সময়ই হার্টকে বেশী কাজ করতে হয় তা নয় । আরও অনেক ক্ষেত্রে, যেমন - জ্বর বা অনেক অসুখের সময়ও হার্টের কাজ বেড়ে যায় যাতে করে সে অতিরিক্ত অক্সিজেন বা খাদ্য শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিতে পারে ।
- স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের বিভিন্ন অংশে পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করতে যতটুকু রক্তের প্রয়োজন তা একটি সুস্থ হার্টে থাকে ।
- গড় আয়ুসম্পন্ন একজন মানুষের সারাজীবনে হার্ট প্রায় এক মিলিয়ন ব্যারেল রক্তসঞ্চালন করে থাকে ।

## হার্ট অ্যাটাক কি ?

- যে রক্তনালী দিয়ে হার্টের মাংসপেশীতে রক্ত সঞ্চালিত হয় সেই রক্তনালী অর্থাৎ করোনারি আর্টারি যদি কোন কারণে ব্লক হয় তাহলে হার্টের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ বা কমে যায়। ফলে হার্ট তার অক্সিজেন ও খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়, যার ফলে হার্টের মাংসপেশী নষ্ট হয় বা পচে যায়। হঠাৎ করে যখন এই করোনারি আর্টারি পুরোপুরি বা অনেকাংশে ব্লক হয় তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে।
- হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে হঠাৎ মৃত্যুর এক নম্বর কারণ।
- একটি মারাত্মক হার্ট অ্যাটাক হার্টকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে ফলে সাথে সাথে মৃত্যু হতে পারে।
- হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন দুই-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় কোন রকম চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার আগেই।
- হার্ট অ্যাটাক হয় হঠাৎ করে কিন্তু এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে অনেক আগে থেকে।
- মানুষ বেশীরভাগ সময়ই বুঝে উঠতে পারে না তার ভিতরে কি সমস্যা হচ্ছে ফলে চিকিৎসা নিতে দেরি করে ফেলে। বেশীরভাগ মানুষই গ্যাস্ট্রিক আলসারের ব্যাথা বলে এটিকে প্রাথমিক অবস্থায় ভুল করে থাকে।
- হার্ট অ্যাটাক যে কোন সময়েই হতে পারে, যেমন - কর্মক্ষেত্রে, খেলার মাঠে, ঘরে বিশ্রামের সময় বা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকাবস্থায়।
- হার্ট অ্যাটাক হলে হার্টের বিশেষ কিছু অংশ নষ্ট হয়ে বা পচে যায়। তবে হার্টের গঠনগত কারণেই এর একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও বাকী অংশ কাজ করতে পারে। তবে উক্ত ক্ষত শুকাতে কিছুটা সময় লাগে। হার্টের ক্ষত বাইরে থেকে দেখা যায় না বলে তাকে তুচ্ছ করলে ভুল করা হবে।
- অধিকাংশ হার্ট অ্যাটাকের রোগী হাসপাতালে নেয়ার আগেই মারা যায়।

## কোলেটারেল সার্কুলেশান কী?

- করোনারি আর্টারি ব্লক হয়ে গেলেও হার্টের মাংসপেশীর রক্তসঞ্চালনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা মানুষের শরীরে আপনা-আপনি তৈরি হয় ।
- যে করোনারি আর্টারি ব্লক হয়ে যায় তার পার্শ্ববর্তী আর্টারি বা ধমনীগুলো প্রসারিত হয় এবং তার ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাগুলোও আক্রান্ত স্থানে বেশী বেশী রক্ত সঞ্চালন করে-এটাকে বলে কোলেটারাল সার্কুলেশন ।
- যে রোগীর কোলেটারেল সার্কুলেশন পদ্ধতি ভালভাবে তৈরি হয় তার অ্যানজিনার উপসর্গগুলো কম দেখা যায় ।
- হার্টের এই অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন হার্ট অ্যাটাকের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে ।
- যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তাদেরও এই কোলেটারেল সার্কুলেশন হার্টের মাংসপেশীর পচন অনেকাংশে রোধ করতে পারে ।
- দ্রুত হাঁটা একটি ভাল ব্যায়াম । নিয়মিত দ্রুত হাঁটলে হার্টের 'ন্যাচারাল বাইপাস' হয় অর্থাৎ নতুন নতুন রক্তনালী তৈরী হয় ।

## হার্ট অ্যাটাক ঘটে কিভাবে?

- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোলেস্টেরল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং রক্তে প্রবহমান অন্যান্য পদার্থ রক্তনালীর গায়ে জমা হতে থাকে তাকে এথেরোস্ক্লেরোসিস বলে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন রক্তনালীর ভিতরের আবরণে ক্ষতের কারণে এথেরোস্ক্লেরোসিসের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
- রক্তনালীর গায়ে জমা হওয়া কোলেস্টেরল বা চর্বি এবং রক্তে প্রবহমান অন্যান্য পদার্থকে বলে প্লাক। এই প্লাকের ফলে রক্তনালী সরু হতে থাকে এবং রক্ত চলাচল ক্রমশ:ই দূরূহ হয়ে পড়ে।
- যদি হার্টের রক্তনালীতে বা করোনারি আর্টারিতে তৈরী হওয়া প্লাক ফেটে গিয়ে রক্তনালী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তবে হার্টের ওই নির্দিষ্ট মাংসপেশী প্রয়োজনীয় রক্ত পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ফলশ্রুতিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হার্টের ওই নির্দিষ্ট মাংসপেশী পচে যাওয়াকেই মেডিকেলের পরিভাষায় বলে মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক।

## রক্তনালীতে চর্বি জমে কেন?

রক্তনালীতে চর্বি জমে -

- অস্বাস্থ্যকর খাবার খেলে।
- শারীরিক শ্রম অপর্যাপ্ত হলে।
- ধূমপান এবং তামাক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার করলে।

## হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ কি ?

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ ঠিকমত বুঝতে পারা অনেক সময় কঠিন। কোনরকম পূর্ব লক্ষণ ছাড়াই শতকরা ৬৪ ভাগ নারী এবং ৫০ ভাগ পুরুষ করোনারি হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। কিছু কিছু হার্ট অ্যাটাক খুব দ্রুত এবং তীব্রভাবে দেখা দেয় কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা শুরু হয় আস্তে আস্তে, মৃদু ব্যথা বা বুকের ভিতর একধরনের অস্বস্তিভাব অনুভবের মাধ্যমে।

**লক্ষণ সমূহ :**

- **বুকের মাঝখানে ব্যথা বা অস্বস্তিভাব** - সাধারণত বেশীরভাগ হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে বুকের ঠিক মাঝখানে ব্যথা বা অস্বস্তিভাব অনুভূত হয়ে কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। এই ব্যথা কমে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে। অনেক সময় ব্যথা না হয়ে একটা অস্বস্তিকর চাপ, মোচরানো অথবা পেট ভরা ভরা ভাব লাগতে পারে।
- **শরীরের অন্যান্য অংশে ব্যথা বা অস্বস্তিভাব** - হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গের মধ্যে ব্যথা বা অস্বস্তিভাব অনেকসময় বুকে না হয়ে শুধু বাম বাহু অথবা দুইবাহু, পিঠের দিকে, ঘাড়ে-গলায়, চোয়ালে কিংবা পেটের উপরের দিকে অনুভূত হতে পারে।
- **শ্বাসকষ্ট হওয়া** - কোন কোন ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ শুধুমাত্র শ্বাসকষ্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।
- **শরীর ঠান্ডা হয়ে ঘাম দেয়া।**
- **অন্যান্য লক্ষণ** - বদহজম, পেটে গ্যাসের মত ব্যথা অনুভূত হওয়া, বমির ভাব হওয়া। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে কোনরকম কারণ ছাড়াই দুর্বল লাগা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া বা অস্বাভাবিক ঘাবড়ে যাওয়া, হঠাৎ করে মাথা হালকাভাব বোধ করা, ঘুম না আসা ইত্যাদি উপসর্গগুলোকেও হার্ট অ্যাটাকের সতর্কীকরণ লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়।

যদি কখনো আপনি বা আপনার আশেপাশের কারো হঠাৎ বুকে ব্যথা বা অস্বস্তিবোধের পাশাপাশি আরও এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দেয় তবে পাঁচ মিনিটের বেশী কালক্ষেপণ না করে দ্রুত কোন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বা ন্যুনতম যে কোন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন।

## হার্ট অ্যাটাক হলে আমাদের কি করা উচিত ?

- যদি কখনো আপনার বা আপনার আশেপাশের কারো হঠাৎ বুকে ব্যথা বা অস্বস্তিবোধের পাশাপাশি আরও এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দেয় তা হলে সম্ভব হলে রোগীকে সাথে সাথে ৩০০ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন খাইয়ে দেবেন এবং পাঁচ মিনিটের বেশী কাললেক্ষপণ না করে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে অথবা কোন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বা যে কোন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন এবং দ্রুত ইসিজি করাবেন।
- মনে রাখবেন প্রতিটি মূহুর্ত এখানে গুরুত্বপূর্ণ।
- হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে অক্সিজেন এবং ব্যাথা নাশক ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পারিয়ে দেয়া উচিত। এরপর প্রয়োজনমতো নাইট্রোগ্লিসারিন, বিটাব্লকার, অ্যাসপিরিন ইত্যাদি ওষুধ দিতে হবে। এরপর যদি রোগীর রক্ত ক্ষরণের ইতিহাস না থাকে তবে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ইনজেকশনের মতো থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।
- থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি হার্ট অ্যাটাকের প্রথম ছয় ঘন্টার মধ্যেই দেয়া উচিত। তবে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় হার্ট অ্যাটাকের প্রথম এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে দিতে পারলে। স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ইনজেকশনের পাশাপাশি চামড়ার নিচে লো-মলিকিউলার ওয়েট হেপারিন বা এনোক্সাপ্যারিন ইনজেকশনও দেয়া হয়।
- সময়মতো থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে রক্তনালীর ব্লক অনেকাংশে অপসারিত হয়ে গিয়ে রক্ত সঞ্চালন পুন:স্থাপনের মাধ্যমে রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।
- আজকাল হার্ট অ্যাটাকের আরও উন্নত চিকিৎসা হচ্ছে। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে প্রাইমারি পিটিসিএ। এই পদ্ধতিতে ধমনীর ভিতরে যেখানে জমাট বাঁধা রক্ত চর্বিতে আটকে থাকে, সেখানে অ্যানজিওপ্লাস্টি বা স্টেন্টিং এর সাহায্যে ধমনীর রক্তপ্রবাহ ফিরিয়ে আনা হয়। এতে হার্টের কর্মক্ষমতা যেমন ফিরে আসে, তেমনি মৃত্যুহারও অনেক কমে যায়।

## হার্ট অ্যাটাকের পর কি স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব?

- অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় হার্ট অ্যাটাকের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগী তার পূর্বের স্বাভাবিক কাজ-কর্মে ফিরে যেতে পারেন।
- হার্টের ক্ষত যদি খুব বড় বা গভীর না হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হার্ট তার রক্ত সঞ্চালনের কাজ পূর্বের মত করতে পারে। সুতরাং স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে ঘরে বসে থাকার প্রয়োজন নেই বরং জীবনধারার কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের বিভিন্ন জটিলতা এড়িয়ে চলার দিকে মনোযোগী হতে হবে।
- বেশিরভাগ হার্ট অ্যাটাকের রোগীই এখন তাদের প্রথম অ্যাটাকের পর সেরে ওঠেন এবং ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যেই আস্তে আস্তে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করে পূর্বের ন্যায় কর্মমুখর জীবন উপভোগ করছেন।
- হার্ট অ্যাটাক থেকে বেঁচে যাওয়া শতকরা ৮০-৯০ ভাগ রোগী তাদের পূর্বের কাজে ফিরে যেতে পারেন ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে। কেউ কেউ ২ সপ্তাহ পরই কাজে যোগদান করতে পারেন। যদিও তাদের কাজে ফিরে যাওয়া নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর:
  - হার্টের ক্ষত কত বড় বা গভীর?
  - কাজের ধরনটা কেমন অর্থাৎ কাজটা কত বেশী শারীরিক শ্রম দাবী করে?
- দুটি বিষয় বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে - আপনি আপনার পূর্বের কাজে ফিরে যাবেন নাকি নতুন কোন কাজ বা পেশা খুঁজবেন।
- উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসকগণ অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক থেকে বেঁচে যাওয়া রোগীদের পূনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠিয়ে তাদের কর্মক্ষমতা যাচাই করে তারপর তাদের পরবর্তী পেশা নির্বাচনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

## হার্ট অ্যাটাকের পর কতটুকু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে ?

- হার্ট অ্যাটাকের পর অবশ্যই আপনার পরিমিত বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু শারীরিক শ্রম বা সামাজিক কাজ কর্ম সবকিছুই সমাজের অন্য দশজনের মতো আপনার জন্যও সমান উপযোগী।
- ডাক্তাররা অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে উঠা রোগীদের একটু বেশী শারীরিকভাবে কর্মঠ থাকতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।
- রাতে ভাল ঘুম সবার জন্যই প্রয়োজন তবে হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে উঠা রোগীদের জন্য আরও বেশী দরকার। মাঝে মাঝে দুপুরে অল্প সময়ের বিশ্রাম শরীরের জন্য ভাল। এই রকম রোগীদেরকে অবশ্যই কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার আগেই বিশ্রাম নেয়া জরুরী।
- হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকে যদি আপনি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়ে থাকেন তবে বাড়ীতে ফিরে গিয়ে আপনি কিছুটা দুর্বল অনুভব করতে পারেন। এটা শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ বা দুর্বল হার্টের কারণে নয়। বরং এই দুর্বলতা দীর্ঘস্থায়ী হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকার কারণে। আপনার নিষ্ক্রিয় মাংসপেশী এই সময়কালে শতকরা ১৫ ভাগ শক্তি ক্ষয় করেছে। এই মাংসপেশীগুলো তাদের হারানো শক্তি ফিরে পায় শুধুমাত্র নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে। তবে নিয়মিত ব্যায়াম করলেও মাংসপেশীগুলোর পূর্বের চেহারা ফিরে পেতে প্রায় ২-৬ সপ্তাহ লাগে।

## হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী কি কি অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক ?

- হার্ট অ্যাটাকের পর একজন রোগীর নানা ধরণের বিচিত্র আবেগ এবং অনুভূতি হয়ে থাকে তবে তার মধ্যে ভয়, রাগ এবং বিষন্নতা অন্যতম।
- সাধারণতঃ হার্ট অ্যাটাকের পর সবচেয়ে বেশী যে অনুভূতিটা লক্ষ্য করা যায় তা হলো ভয়। সেসময় যে কথাটি বেশী মনে আসে তা হলো- 'আমি কি মরে যাব? হার্ট অ্যাটাকের সময়ের মত তীব্র বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট আবার দেখা দেবে কিনা? নানা শারীরিক উপসর্গও অনেক সময় মনে ভয় জাগায়। যদিও এই চিন্তাগুলো অস্বস্তিকর তবুও এগুলো এড়ানো যায় না। তবে সময়ের সাথে সাথে সব দুশ্চিন্তাই দূর হয়ে যায়।
- রাগ হওয়া বা উত্তেজিত হওয়া আরেকটি বড় বিষয় যা আমরা প্রায়শঃই পেয়ে থাকি। এক্ষেত্রে রোগীর চিন্তা হয় "কেন আমারই হার্ট অ্যাটাক হলো?"
- রোগীর জন্য এসময়টা অবশ্যই দুঃসময়। এই সময় সে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারে। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব সবার থেকে আশানুরূপ সহানুভূতি না পেলে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি অনীহা চলে আসতে পারে।
- অনেকের মধ্যে এরকম চিন্তাও কাজ করে যে, সে বোধ হয় আর আগের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। কিংবা আগের মতো পরিশ্রম করতে পারবে না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং নিজেকে সেরে ওঠার জন্য সময় দিতে হবে।
- অনেকে তাদের যৌনজীবন নিয়ে চিন্তিত হয়ে থাকেন। কেননা দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার কারণে প্রাথমিকভাবে অনেকেই নিজেকে দুর্বল ভাবতে থাকেন বা সাময়িকভাবে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। যদি এরকম অবস্থার সম্মূখীন হন তবে অবশ্যই আপনার স্ত্রী/স্বামীকে সাথে নিয়ে ডাক্তারের সাথে খোলামেলাভাবে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন ।
- মনে রাখবেন অধিকাংশ মানুষই হার্ট অ্যাটাকের ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যেই তাদের স্বাভাবিক যৌনজীবনে ফিরে যেতে পারেন।

- সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের সময় থেকে ৬ মাসের মধ্যেই এ সব অনুভূতিগুলো পুরোপুরি চলে যায়। সুতরাং, এই সময়ে আপনাকে যেমন ধৈর্য্য ধরতে হবে, তেমনি পরিবারের সদস্য এবং বন্ধু স্বজনদের আরও বেশী সহানুভূতিশীল হওয়ার দরকার, যাতে করে এই দুঃসময়টা পার করতে পারেন। তবে প্রয়োজনে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।
- হার্ট অ্যাটাক থেকে প্রাথমিকভাবে সেরে ওঠার পর সবারই বুকে ব্যথা হবে এমন নয়। তবে অনেক সময় হতেই পারে এবং এই ব্যথাকে পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল অ্যানজিনা (Post MI Angina) বলা হয়।

## অ্যানজিনা কি?

- হার্টের মাংসপেশীতে অপর্যাপ্ত রক্তসঞ্চালনের কারণে অ্যানজিনা হয়ে থাকে।
- অ্যানজিনার ক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহ কমে যায় মূলতঃ যখন হার্টের মাংসপেশী বেশী কাজ করে।
- এই সাময়িক কম রক্ত প্রবাহের কারণে বুকে অস্বস্তিবোধ হয়।
- অ্যানজিনার কারণে হার্টের মাংসপেশী পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়না।
- যে সমস্যাগুলোর কারণে অ্যানজিনা হয় সেগুলোর কারণে অ্যানজিনা থেকে একসময় হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। আবার অনেকের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরও অ্যানজিনা হয়।
- বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দীর্ঘ মেয়াদি অ্যানজিনার রোগীদের মধ্যে শতকরা ৬৪ জন একাধিক ওষুধ গ্রহণ করে। শতকরা ৯০ ভাগ রোগীই Effort Angina-তে ভুগছে।

## স্ট্রোক কি ?

- স্ট্রোকও হার্ট অ্যাটাকের মতোই তবে ঘটনাগুলো ঘটে হার্টের পরিবর্তে মস্তিস্কে ।
- গলার দুই পাশ দিয়ে উঠে যাওয়া দুটো বড় রক্তনালীর সাহায্যে হার্ট মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চালন করে ।
- বড় রক্তনালীগুলো বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মস্তিস্কের সকল অংশে অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহ করে ।
- মস্তিস্ক তখনই কাজ করে যদি তার ভিতরে সঠিকভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় ।
- মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চালিত হয় সেরিব্রাল আর্টারির মাধ্যমে ।
- যদি মস্তিস্কের রক্তনালী বা সেরিব্রাল আর্টারি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় বা বাধাগ্রস্ত হয়, তবে মস্তিস্কের ওই নির্দিষ্ট অংশ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও খাদ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় ।
- ফলশ্রুতিতে মস্তিস্কের বিশেষ অংশ খাদ্যাভাবে নষ্ট হয়ে যায় বা পচে যায় । এটাকেই স্ট্রোক বলে ।
- স্ট্রোককে কোন কোন ক্ষেত্রে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস অথবা সেরিব্রাল হিমোরেজ বলে । ক্ষণস্থায়ী স্ট্রোককে ট্রানজিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক বলে । অন্য কথায় স্ট্রোককে বলা হয় সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ ।
- মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিড়ে গিয়ে রক্তরণ হয়ে মস্তিষ্কের কোষগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে । এটাকে বলে ইন্ট্রাসেরিব্রাল হিমোরেজ বা অন্তমস্তিষ্ক রক্তক্ষরণ । উচ্চ রক্তচাপের কারণে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে ।
- যদি কারও হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হয় তাহলে হার্টের ভিতর রক্ত জমাট বাঁধতে পারে এবং এই জমাট বদ্ধ রক্তদলা রক্তনালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে চলে যেতে পারে । তখন এই রক্তদলা মস্তিষ্কের ছোট ছোট রক্তনালীতে আটকে গিয়ে রক্তনালী ব্লক হয়ে যায় । ফলে ঐ বিশেষ রক্তনালী মস্তিষ্কের যে জায়গায় রক্তসঞ্চালন করে তা বন্ধ হয়ে গিয়ে স্ট্রোক হতে পারে ।

## হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের রিস্ক ফ্যাক্টর কি ?

- হার্ট অ্যাটাক বা করোনারি হৃদরোগ হলো একাধিক কারণে সৃষ্টি হওয়া অনেকগুলো রোগের বৃহদার্থে সমন্বিত নামকরণ। আর রিস্ক ফ্যাক্টর হলো একধরনের অবস্থা বা অভ্যাস যা রোগ তৈরীতে সাহায্য করে। একটি সুস্থ হার্ট যে সকল কারণে অসুস্থ হয়ে যায় সেগুলোকেই হৃদরোগের রিস্ক ফ্যাক্টর বলে।
- যে কারণে এই রোগ হয় অর্থাৎ রিস্ক ফ্যাক্টর এবং এই রোগের লক্ষণ ও উপসর্গগুলো সম্পর্কে জানা হচ্ছে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম পদক্ষেপ।
- আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন, আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলোজি, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলোজি সহ বিভিন্ন সংস্থা গবেষণা করে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের কতকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর নির্ণয় করেছে। যার শরীরে যত বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে তার হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা তত বেশি। কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, যেমন ক্রমবর্ধমান বয়স, লিঙ্গ ও বর্ণ, হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস এবং হৃদরোগের পূর্ব ইতিহাস। কিন্তু অধিকাংশ রিস্ক ফ্যাক্টরই পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা সম্ভব।
- হৃদরোগে মৃত্যুর শতকরা ৭০ ভাগই নিয়ন্ত্রণযোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর সাথে সম্পর্কিত। ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সী নারীদের শতকরা ৩১ জনের কমপক্ষে একটি রিস্কফ্যাক্টর আছে যা কিনা সে পরিবর্তন করতে পারে। আরো শতকরা ৩১ জনের ২টি এবং শতকরা ১৭ জনের ৩টি বা তার অধিক রিস্ক ফ্যাক্টর আছে।
- হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকির কারণগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় -
    ১) নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন অযোগ্য।
    ২) নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন যোগ্য।

## হার্ট অ্যাটাকের কোন্ কোন্ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়?

হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের যে সকল ঝুঁকি বা রিস্কফ্যাক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় :

### বয়স

- বয়স যত বাড়বে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনাও বাড়তে থাকবে। ৫৫ বছরের পরে প্রতি ১০ বছর অন্তর হৃদরোগের ঝুঁকি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।
- পুরুষদের হার্ট অ্যাটাক হয় তুলনামূলকভাবে কম বয়সে।

### লিঙ্গ

- ঋতুবতি মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি। ঋতু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুরুষ এবং মহিলাদের হৃদরোগের ঝুঁকি প্রায় সমান।
- পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। প্রতি বছর ৫৫ হাজার বেশী নারী স্ট্রোকে আক্রান্ত হয় এবং স্ট্রোকে মৃত্যুর শতকরা ৬০ ভাগই নারী।

### বর্ণ

- শ্বেতাঙ্গ নারীদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশিয়ান নারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই স্ট্রোকের কারণে মৃত্যু হার বেশি।
- বর্ণ এবং জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু নারীদের অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুহার শ্বেতাঙ্গ নারীদের তুলনায় বেশী।

### হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের পূর্ব ইতিহাস

- যাদের একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাদের দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেক বেশি।
- ক্ষণস্থায়ী ইস্কেমিক অ্যাটাক (TIA) বা 'মিনি স্ট্রোক' ও স্ট্রোকের

একটি রিস্ক ফ্যাক্টর ।

## হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের পারিবারিক ইতিহাস

- নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই যাদের বাবা-মা, ভাই-বোন বা রক্তের সম্পর্কিত কোন নিকটাত্মিয়ের হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আছে তাদের হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি ।
- যাদের বাবা-ভাই ৫৫ বছর এবং মা-বোন ৬৫ বছরের পূর্বে হৃদরোগ বা ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি ।

## হার্ট অ্যাটাকের কোন্ কোন্ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা সম্ভব ?

হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের যে সকল রিস্কফ্যাক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা সম্ভব -

- উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন
- ধূমপান
- রক্তে কোলেষ্টেরলের ভারসাম্যহীনতা বা ডিসলিপিডেমিয়া
- রক্তে উচ্চমাত্রায় গ্লুকোজ বা ডায়াবেটিস
- অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস
- অতিরিক্ত ওজন বা মেদভূঁড়ি
- অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম
- অতিরিক্ত মদ্যপান
- সামাজিক চাপ ও মানসিক দূশ্চিন্তা

## হার্ট অ্যাটাকের বিশেষ ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর কি ?

### মেটাবলিক সিনড্রোম

- মেটাবলিক সিনড্রোম হলো হৃদরোগের অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরের সমন্বয়। যার মধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে লিপিড ভারসাম্যহীনতা, ইনস্যুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং এবডোমিনাল ওবেসিটি বা পেট মোটা। এককভাবে এরা প্রত্যেকেই হৃদরোগেরও চিহ্নিত রিস্ক ফ্যাক্টর। সুতরাং এগুলোর সমন্বিত অবস্থান অবশ্যই হৃদরোগের ঝুঁকিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।

### স্লিপ-অ্যাপনিয়া

- ঘুমের মধ্যে পুনঃ পুনঃভাবে শ্বাস বন্ধ হওয়া এবং আবার শুরু হওয়াকে স্লিপ-অ্যাপনিয়া বলে। এর ফলে হঠাৎ করে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয় এবং রক্তচাপ বেড়ে যায়। পাশাপাশি কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের উপরে চাপ পড়ে ফলে করোনারি হৃদরোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

## হার্ট অ্যাটাকের নতুন ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর কি ?

### সি-রিয়্যাকটিভ প্রোটিন (সিআরপি)

- একধরনের স্বাভাবিক প্রোটিন। শরীরের কোন অংশ ফুলে গেলে এবং করোনারী ধমনী সরু হয়ে গেলে রক্তে সিআরপি মাত্রা বেড়ে যায়। উচ্চমাত্রায় সিআরপিকে হৃদরোগের একটি রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে গণ্য করা হয়।

### ফিব্রিনোজেন

- একধরনের প্রোটিন যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত পরিমাণে ফিব্রিনোজেন রক্ত এবং রক্তের প্লেটলেট জমাট বাঁধিয়ে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক হওয়ায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

### হোমোসিস্টিন

- মেনোপজের পর রক্তে হোমোসিস্টিন বেড়ে যায়। প্রচুর পরিমানে ফলিক এসিড, ভিটামিন বি$_{৬}$, ভিটামিন বি$_{১২}$ খেলে হোমোসিস্টিন কমে যায়।

### লাইপো প্রোটিন 'এ'

- এ ধরনের লাইপোপ্রোটিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। নিয়াসিন জাতীয় কোলেস্টেরল কমানোর ঔষধ খেলে রক্তে লাইপোপ্রোটিন কমে।

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর

# উচ্চরক্তচাপ

## উচ্চ রক্তচাপ কি?

- রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালীর গায়ে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী রক্তচাপকেই উচ্চ রক্তচাপ বলে।

- ২০০৩ সালে গৃহিত এবং ২০০৭ সালে পুণর্মূল্যায়িত ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব হাইপারটেনশন ও ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলোজি এর যৌথ গাইডলাইন অনুযায়ী উচ্চ রক্তচাপের সংজ্ঞা বা প্রকারভেদকে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হয়েছে :

| প্রকারভেদ | সিস্টোলিক | ডায়াস্টোলিক |
|---|---|---|
| অনুকূল / কাঙ্খিত | < ১২০ | < ৮০ |
| স্বাভাবিক | ১২০-১২৯ | ৮০-৮৪ |
| উচ্চ স্বাভাবিক | ১৩০-১৩৯ | ৮৫-৮৯ |
| গ্রেড-১ উচ্চ রক্তচাপ | ১৪০-১৫৯ | ৯০-৯৯ |
| গ্রেড-২ উচ্চ রক্তচাপ | ১৬০-১৭৯ | ১০০-১০৯ |
| গ্রেড-৩ উচ্চ রক্তচাপ | ≥ ১৮০ | ≥ ১১০ |
| আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন | ≥ ১৪০ | < ৯০ |

- সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে ১২০/৮০ বা এর নিচের মাত্রাকে কাঙ্খিত মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। তবে এ মাত্রা ১৩৯/৮৯ পর্যন্ত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কমবেশী স্বাভাবিক হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

- রক্তচাপ যখন স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলি। উচ্চ রক্তচাপেরও প্রকারভেদ আছে। যেমন- গ্রেড ১ বা উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ সিস্টোলিক প্রেসার ১৪০-১৫৯ এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার ৯০-৯৯। এই মাত্রা আরও বেড়ে গেলে তা হয় গ্রেড ২ বা উচ্চ রক্তচাপের দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ সিস্টোলিক প্রেসার ১৬০ বা তার বেশী এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার ১০০ বা তার বেশী। আর সিস্টোলিক প্রেসার ১৮০ বা তার বেশী এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার ১১০ বা তার বেশী হলে তাকে গ্রেড ৩ বা উচ্চ রক্তচাপের তৃতীয় পর্যায় বলে।

- আরও এক প্রকার উচ্চ রক্তচাপ আছে যাকে শুধুমাত্র আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন বলে। এক্ষেত্রে সিস্টোলিক প্রেসার ১৪০ এর উপরে থাকবে এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার ৯০ এর নিচে থাকবে।
- আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশনকেও তিনটি গ্রেডে ভাগ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে শুধু সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের মাত্রাই বিবেচ্য হবে।

## উচ্চ রক্তচাপ কেন একটি নীরব ঘাতক?

- হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ।
- সমগ্র বিশ্বে ৬০ কোটিরও বেশী মানুষ উচ্চ রক্তচাপের কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং হার্ট ফেইলিওরের ঝুঁকির সম্মুখে আছে। যার মধ্যে ৪২ কোটিরও বেশী মানুষ অবস্থান করছে আমাদের মতো অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এবং ১৮ কোটিরও বেশী মানুষ অবস্থান করছে উন্নত দেশগুলোতে।
- সাধারণত এর কোন লক্ষণ দেখা যায়না, কিন্তু আপনার হার্ট এবং রক্তনালীর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। ফলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়।
- স্বাভাবিক রক্তচাপ সম্পন্ন মানুষের তুলনায় উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ঝুঁকি তিনগুণ বেশী।
- ৪০ উর্ধ্ব একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির তুলনায় উচ্চ রক্তচাপ আছে এমন ব্যক্তির স্ট্রোকের সম্ভাবনা শতকরা ৩০ ভাগ বেশি থাকে।

## উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকিসমুহ

## উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

- অতিরিক্ত ওজন থাকলে ।
- শারীরিক পরিশ্রম কম করলে ।
- অতিরিক্ত লবণ এবং চর্বিযুক্ত (প্রাণিজ চর্বি) খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ।
- অতিরিক্ত মদ্যপান করলে ।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি উচ্চ রক্তচাপ অথবা হৃদরোগের পূর্বইতিহাস থাকে ।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরলের পূর্ব ইতিহাস থাকে ।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি ডায়াবেটিসের পূর্ব ইতিহাস থাকে ।
- ধুমপানের অভ্যাস থাকলে ।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে ।
- অতিরিক্ত টেনশন করলে ।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি পলিসিস্টিক কিডনি রোগের পূর্ব ইতিহাস থাকে ।
- মুত্রনালীতে প্রদাহ থাকলে ।
- কিছু কিছু ঔষধ সেবনেও রক্তচাপ বাড়তে পারে ।

## উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের হৃদরোগ সম্ভাবনার ঝুঁকি সমূহ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | রক্তচাপের মাত্রা | সিস্টোলিক<br>ডায়াস্টোলিক | > ১৪০ মিমি মারকারি<br>> ৯০ মিমি মারকারি |
| ২. | বয়স | পুরুষ<br>মহিলা | > ৫৫ বছর<br>> ৬৫ বছর |
| ৩. | ধূমপান | | |
| ৪. | ডিসলিপিডিমিয়া | মোট কোলেস্টেরল<br>এলডিএল কোলেস্টেরল<br><br>এইচডিএল কোলেস্টেরল:<br>পুরুষ<br>মহিলা | > ২৫০ মি.গ্রা./ডি.এল<br>> ১৫৫ মি.গ্রা./ডি.এল<br><br>> ৪০ মি.গ্রা./ডি.এল<br>> ৪৮ মি.গ্রা./ডি.এল |
| ৫. | ডায়াবেটিস | FPG বা অভুক্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ | ৭ মিলিমোল/লিটার |
| | | PPG বা খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ | ১১ মিলিমোল/ লিটার |
| ৬. | অপরিণত বয়সে হৃদরোগের পরিবারিক ইতিহাস | | |
| ৭. | মেদভুঁড়ি | কোমড়ের মাপ :<br>পুরুষ<br>মহিলা | <br>> ১২০ সে. মি.<br>> ৮৮ সে. মি. |
| ৮. | সি-রিয়্যাকটিভ প্রোটিন | | > ১ মি.গ্রা./ডি.এল |

## উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ

সাধারণত জটিলতাবিহীন উচ্চ রক্তচাপের (Uncomplicated Hypertension) ক্ষেত্রে তেমন কোন লক্ষণ দেখা নাও যেতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন-

- মাথা ব্যথা (বিশেষ করে মাথার পিছন দিকে)
- মাথা ঘোরানো
- নাক দিয়ে রক্ত পরা
- ঘাড় ব্যথা
- ঘামানো
- শ্বাস কষ্ট

## ব্লাড প্রেসার পরীক্ষার নিয়মাবলী

- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষার প্রারম্ভে রোগীকে কয়েক মিনিট নিরিবিলি করে শান্তভাবে অবস্থান করতে হবে। কেননা হেঁটে বা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠার কারণে রোগীর পরিশ্রম হয়। ফলে শরীরের রক্তচাপ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেতে পারে।
- রক্তচাপ মাপার সময় কমপক্ষে দুইবার ১-২ মিনিট ব্যবধানে মাপ নেয়া ভাল। প্রথম দুইবার মাপের ক্ষেত্রে যদি রক্তচাপের তারতম্য দেখা যায় তবে ৩য় বার মাপ নেয়া যেতে পারে।
- রোগী যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, রক্তচাপ পরিমাপের যন্ত্রের 'কাফ' রোগীর হার্টের লেভেলে রাখতে হবে। বর্তমানে কিছু ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র রোগীরা নিজেরাই ব্যবহার করে থাকেন। সেইসব যন্ত্রের ক্ষেত্রে 'কাফ' বাঁধা হয় কব্জিতে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে কনুই ভাঁজ করে কব্জি হার্টের লেভেলে রাখতে হয়।
- প্রথমবার রক্তচাপ পরিমাপের ক্ষেত্রে রোগীর উভয় হাতেই মাপ নেয়া উচিত। কেননা বিভিন্ন রোগের কারণে দুই বাহুতে দুই রকম রক্তচাপ পাওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তুলনামূলক উচ্চ মাত্রাকেই হিসেবে নিতে হবে।

## কখন উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা প্রয়োজন ?

- কোন ব্যক্তির যদি সিস্টোলিক রক্তচাপ নিয়মিতভাবেই ১৮০ বা তার বেশী থাকে এবং/অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১১০ বা তার বেশি থাকে তবে কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই যত দ্রুত সম্ভব ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিত ।
- এমন কোন ব্যক্তি যার মধ্যে হৃদরোগের একাধিক রিস্ক ফ্যাক্টর বিদ্যমান, পাশাপাশি যার সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৪০ বা এর চেয়ে বেশী এবং/অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ বা তার বেশী তবে তাকেও দ্রুত ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে ।
- যাদের রক্তচাপ ১৪০/৯০ বা তার বেশী আছে কিন্তু হৃদরোগের ঝুঁকির মাত্রা কম এবং যাদের টার্গেট অর্গানগুলো অক্ষত আছে তাদেরকে প্রথমে জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে । প্রয়োজনে ঔষধের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে ।
- দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া যাদের সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৪০ এর নীচে এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ এর নীচে তাদের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার দরকার নেই ।
- একথাও মনে রাখতে হবে যে, রক্তচাপ কমানোর ঔষধ শুধু রক্তচাপই কমায় না, বরং অনেক ঔষধই হৃদরোগজনিত মৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করে ।
- উচ্চ রক্তচাপ আক্রান্ত সকল রোগীর ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পাশাপাশি নিজেদের জীবনধারার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক । এর ফলে রোগীর উচ্চ রক্তচাপ কমে যাবে, অন্যান্য ঝুঁকি এবং চিকিৎসার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকবে ।

## উচ্চ রক্তচাপ কমালে কি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে?

- রক্তচাপ কিছুটা কমলে হৃদরোগের এবং স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে।
- স্ট্রোক পরবর্তী বেঁচে যাওয়া উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন রোগীদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রেসার কমানোর জন্য ওষুধের চিকিৎসায় স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায় শতকরা ২৯ ভাগ এবং এর পাশাপাশি হৃদরোগের সম্ভাবনাও বহুলাংশে কমে যায়।
- উচ্চ রক্তচাপ (সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ দুটোই) এবং হৃদরোগের ঝুঁকির মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ রক্তচাপ বাড়লে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়বে। এই সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, নিবিড়, স্বাধীন এবং গুরুত্বপূর্ণ।
- উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে রোগী এবং ডাক্তার উভয়কেই রক্তচাপ-এর মাত্রার পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি সমূহ এবং উচ্চ রক্তচাপের ফলে শরীরের যে সকল অংঙ্গগুলো বা অরগান বা অঙ্গগুলো নষ্ট হয় তাদের বর্তমান অবস্থা এবং এদের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ককে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে।
- উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার অর্থ শুধু ব্লাড প্রেসার কমানো নয় বরং এর পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি সমুহের পরিবর্তন এবং সহযোগী রোগগুলোর চিকিৎসার মাধ্যমে টার্গেট অর্গানগুলোকে রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য।

## জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কি সম্ভব ?

- **ধূমপান ত্যাগ করা** - সমীক্ষায় দেখা গেছে, ধূমপানের ফলে সারাবিশ্বে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন মানুষের মৃত্যু হয়। এভাবে বছরে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ ধূমপানের প্রভাবেই মারা যায়। যদিও এককভাবে উচ্চ রক্তচাপের উপর ধূমপানের প্রভাব সামান্য, তবুও সামগ্রিকভাবে ধূমপানের ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়। যারা মধ্য বয়সেই ধূমপান বর্জন করেছেন তাদের আয়ুষ্কাল অধূমপায়ীদের মতোই এবং এই ধূমপান বর্জন উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণে একক শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।

- **অতিরিক্ত মদ্যপান ত্যাগ করা** - অতিরিক্ত মদ্যপান উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং অতিরিক্ত মদ্যপান অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত।

- **ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা** - অতিরিক্ত ওজনের ফলে স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল গড়ে ৯ বছরের মত কমে যায়। অতিরিক্ত শারীরিক ওজন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস (Type-II), মাত্রাতিরিক্ত চর্বি, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত ওজন এ সমস্ত রোগে মৃত্যুর ঝুঁকিও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করে তথা সমন্বিত খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

- **শারীরিক পরিশ্রম করা** - পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ লোক শারীরিক পরিশ্রম কম করে, বিশেষত মহিলারা। শারীরিক পরিশ্রম ওজন নিয়ন্ত্রণে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমাতে বা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। সাধারণত মুক্তবায়ুতে প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫-৬ দিন ব্যায়ামই যথেষ্ট।

- **আলুগা লবণ পরিহার করা** - বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং প্রতিদিন খাবারে লবণের পরিমান ৮০-১০০ মিলিমোল (৪.৭-৫.৮ গ্রাম) কমালে রক্তচাপ কমে গড়ে ৪-৬ মিমি মারকারী। তাই প্রতিদিনের খাবারে আলগা লবণ এবং অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার পরিহার করা উচিত।

- **টাটকা ফল এবং শাকসবজি আহারের অভ্যাস করা** - পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আবার কম ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুতরাং পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ টাটকা ফল এবং

শাকসব্জি উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করে ।

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর

# ধূমপান

## ধূমপানের সাথে হৃদরোগের সম্পর্ক কি ?

- একথা আজ পরীক্ষিত সত্য যে, ধূমপায়ীদের হৃদরোগের সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের তুলনায় তিন থেকে পাঁচগুণ বেশী ।
- সিগারেট, বিড়ি, চুরুট ইত্যাদি তামাকের ধোঁয়ায় যে নিকোটিন থাকে, তা হৃদপিন্ড সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের প্রচন্ড ক্ষতি করে ।
- নিকোটিন রক্তে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন-এর পরিমাণ প্রচন্ড পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় । ফলে রক্তে এইচডিএল কোলেস্টেরল বা ভাল কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ কমে যায় ।
- নিকোটিন ধমনীর স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়, ফলে ধমনীর ভিতরের রাস্তা ছোট হয়ে যায়, রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় ।
- অধূমপায়ী রোগীদের থেকে ধূমপায়ী রোগীদের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর হার ৭০ শতাংশ বেশি । এ ছাড়া ধূমপায়ীদের Sudden Death অর্থাৎ হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনাও অনেক বেশি ।
- যত কমবয়সে ধূমপান শুরু করবেন হৃদরোগের সম্ভাবনা বা ঝুঁকি বাড়বে তত বেশী ।
- ধূমপান করে না, কিন্তু ধূমপায়ীদের আশে-পাশে অবস্থানকারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় শতকরা ৩০ ভাগ । এই মরণ ছোঁয়া শিশুদের দিকেই আগে হাত বাড়াতে থাকে । পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী শিশু Passive Smoking - এর শিকার হচ্ছে যেহেতু বাড়িতে তাদের বসবাস করতে হচ্ছে ধূমপায়ী পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনদের সাথে ।
- অল্পবয়সে কেউ ধূমপান শুরু করলে বয়স্কালে সে ধূমপান জনিত রোগের একটি বড় ধরণের ঝুঁকির সম্মুখে থাকে । এদের মধ্যে অর্ধেক শিশু-কিশোর ধূমপান ক্রমান্বয়ে চালিয়ে যেতে থাকে, যা তাদের বার্ধক্যে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

- ধূমপানের ফলে তারা ভবিষ্যতে আক্রান্ত হয় করোনারি বা ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হাঁপানি, যা, ফুসফুসে ক্যান্সার, পেপটিক আলসার ইত্যাদি নানা জটিল রোগে।

- একজন অনেকদিনের ধূমপায়ীর মৃত্যুর শতকরা ৫০ ভাগ কারণ সিগারেটের সাথে নিকোটিন সেবন এবং বাকি শতকরা ৫০ ভাগ হয়ে থাকে ধূমপান জনিত হৃদরোগের কারণে।

- সমস্ত রোগের (হৃদরোগ, ক্যান্সার, বক্ষব্যাধি) কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আগামী ২০২০ সালে ধূমপানই হবে মৃত্যুর প্রধান কারণ। আগামী ২০২০ সাল নাগাদ আশংকা করা হচ্ছে বাৎসরিক ৮৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে কেবলমাত্র ধূমপানের ফলে। পক্ষান্তরে ১৯৯০ সালে এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ।

- বিশ্বব্যাপি ১৪০০০ হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান ঝুঁকির কারণ ধূমপান, যা কিনা শতকরা ৪০ ভাগ। এর পরবর্তি স্থানে আছে যথাক্রমে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরল।

- ধূমপান এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি এক সাথে গ্রহণ করলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দৈনিক ১৫টি সিগারেট এবং তার সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে ৩-৫ গুণ আর দৈনিক ১৫টির বেশী সিগারেট খেলে এই ঝুঁকি বেড়ে যায় ২০ গুণ এবং এর বিশেষ প্রভাব পড়ে গর্ভে থাকাকালীন শিশুর উপর-যা ভবিষ্যতে তার জন্য ক্ষতি বয়ে আনে।

- WHO-এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ধূমপান ছেড়ে দেয়ার এক বছরের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৫০ শতাংশ আর ১৫ বৎসর পর এই ঝুঁকি কমে হয় অধূমপায়ীদের মতো।

- স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও ধূমপান ছেড়ে দেয়ার ৫ বছর পর ঝুঁকির পরিমাণ অধূমপায়ীদের তুলনায় বেশী নয়।

## ধূমপান নিয়ন্ত্রণের উপায়

- ধূমপান ত্যাগ করা একটি জটিল এবং কঠিন প্রক্রিয়া। কারণ ধূমপান একটি মারাত্মক আসক্তি, যা শরীর এবং মন উভয়ের উপরই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ধূমপান ত্যাগে চিকিৎসকের পরমর্শের পাশাপাশি রোগীর আত্মোপলব্ধি এবং সদিচ্ছাই হচ্ছে প্রাথমিক ধাপ। এর সাথে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো ধূমপান ত্যাগে সহায়তা করবে।
- ধূমপান সম্পর্কিত বাস্তব চিত্র আপনার শিশুর সামনে তুলে ধরুন। স্বাস্থ্যের উপর ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন।
- যে বয়সে শিশুরা সাধারণত ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে তার আগেই তাদের সাথে আলোচনা করুন।
- সিগারেট কোম্পানীগুলোর বাহারী বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হবেন না। এবং সিগারেটের বিজ্ঞাপনের প্রচার বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সর্বোপরি শিশুর বাবা-মা হিসেবে আপনি/আপনারা যদি ধূমপায়ী হন তবে চেষ্টা করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধূমপান পরিহার করতে।
- স্ত্রীর সহায়তার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তাও একজন ধুমপায়ীর ধূমপান ত্যাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।
- ধূমপান ত্যাগের প্রাথমিক পর্যায়ে ধূমপানের বিকল্প হিসেবে নিকোটিন চুইংগামের ব্যবহার উন্নত দেশগুলোতে বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসছে এবং এর সফলতার হারও আশাব্যঞ্জক। যদিও আমাদের দেশে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।
- অতি সম্প্রতি আমাদের দেশে ধূমপানের নেশা ত্যাগে সহায়ক কিছু ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে। যথাযথ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তা গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া সম্ভব।

- ধূমপান মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে অফিস-আদালত বা কর্মস্থল, পার্ক, সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট, যানবাহন, দর্শনীয় স্থান, রেলষ্টেশন, বাসটার্মিনাল, লঞ্চঘাট ইত্যাদি জনবহুল এলাকাগুলোকে ধূমপান মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষনা দেয়া এবং তা সঠিকভাবে মেনে চলা।
- ধূমপান মুক্ত এলাকার ঘোষনা দেয়া এবং পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের কিন্তু সাধারণ জনগণকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে।
- তামাক এবং ধূমপান হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা সাধারণভাবে দ্বিগুণ করে। তাই নিজে তামাক ও ধূমপান থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার চারপাশ তামাক ও ধূমপান মুক্ত করে হৃদরোগমুক্ত সুস্থ জীবন গড়ে তুলুন।

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর
রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা
বা

# ডিসলিপিডেমিয়া

## কোলেস্টেরল কি?

- কোলেস্টেরল আসলে ফ্যাট জাতীয় এক প্রকার পদার্থ।
- কোলেস্টেরল একটি নরম, সাদা মোমের ন্যায় বস্তু যা রক্তস্রোতে পাওয়া যায়।
- রাসায়নিক গঠন অনুসারে জটিল মনোহাইড্রিক সেকেন্ডারি অ্যালকোহল এবং স্টেরল পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।
- কোলেস্টেরল পানিতে গলে না অথচ কোরোফর্ম, ইথার, অ্যালকোহলসহ যে কোনও ফ্যাট দ্রাবকেই গলে যায়।
- চর্বি বা তেলের সঙ্গে যুক্ত হলে প্রচুর পরিমানে জল শুষে নিতে পারে।
- আমাদের সকলের দেহে কোলেস্টেরল আছে। আমাদের দেহই কোলেস্টেরল তৈরি করে।
- প্রতিদিন গড়ে এক থেকে ১.৫ গ্রাম কোলেস্টেরল আমাদের দেহে সংশ্লেষিত হয়।
- মাংস এবং গবাদি পশুজাত খাদ্যেও কোলেস্টেরল থাকে। উদ্ভিদজাত খাদ্যে কোলেস্টেরল থাকে না।
- আমরা খাদ্য থেকে দৈনিক কমবেশি মাত্র ৩০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল পেয়ে থাকি।
- রক্তে কোলেস্টেরল প্রবাহিত হয় লাইপোপ্রোটিন যৌগ রূপে। এই লাইপোপ্রোটিন হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিনযুক্ত কোলেস্টেরল। যাতে বিভিন্ন ঘনত্বের প্রোটিন থাকে, যেমন-
  - হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা HDL (ভাল কোলেস্টেরল)
  - লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা LDL (খারাপ কোলেস্টেরল)
  - ইন্টারমিডিয়েট লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা ILDL
  - ভেরি লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা VLDL
  - কাইলোমাইক্রন (Chylomicron)

  তবে সব ধরনের কোলেস্টেরলই হৃদরোগের ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত।

## কোলেস্টেরল আমাদের শরীরে কি কাজে লাগে?

- দেহের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোলেস্টেরল অপরিহার্য।
- পুরুষ এবং নারীর সেক্স হরমোন (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, এস্ট্রাডিয়ল ইত্যাদি) উৎপাদন।
- ফ্যাট জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য গাইকোলেট পিত্ত লবণ তৈরি।
- ত্বকে ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ।
- আমাদের কিডনির ওপরে অবস্থিত অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে গ্লুকোকর্টিকয়েড (কার্বহাইড্রেট বিপাকের জন্য যা প্রয়োজন), মিনারেলোকর্টিকয়েড (দেহে খনিজ লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে) এবং সেক্স স্টেরয়েড হরমোনের নিঃসরণ-এ সবকিছুর নেপথ্যেই রয়েছে কোলেস্টেরলের অবদান।

## কোলেস্টেরলের অভাবে কি সমস্যা হতে পারে?

- কোলেস্টেরলের অভাবে মানুষ তার প্রজনন ক্ষমতা হারাতে পারে।
- লিভার হারাবে তার হজম করানোর ক্ষমতা। দেহের সমস্ত বিপাকীয় ব্যবস্থা পড়বে ভেঙে।
- ভিটামিন ডি তৈরিতে পড়বে ঘাটতি, হাড় হবে ভঙ্গুর। দেখা দেবে রিকেট, অস্টিওম্যালেসিয়া। দুর্বল হবে দাঁত।
- এক কথায় কোলেস্টেরলের অভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকাটাই দুঃসাধ্য হয়ে যেতে পারে।

## রক্তে কোলেস্টেরল কি কারণে বাড়ে?

চর্বি জাতীয় খাবার খেলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে। এছাড়া রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে যাবার পেছনে আরো কতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে।

এই রিস্কফ্যাক্টরগুলো দু'ধরনের হয়। যেমন - নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য।

### নিয়ন্ত্রণযোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টর

- ডায়াবেটিস
- হাইপোথাইরয়ডিজম
- অতিরিক্ত ওজন
- অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম।

### অনিয়ন্ত্রণযোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টর

- বংশগত কারণ : বংশগত কারণে শরীরে দেখা দিতে পারে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা।
- বয়স : বয়স বাড়ার সাথে সাথে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়তে পারে।
- সাধারণত ২০ বছর বয়সের পর থেকে মানবদেহে কোলেস্টেরল বাড়তে শুরু করে।
- ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষের দেহে কোলেস্টেরলের পরিমাণ মহিলাদের তুলনায় কম থাকে।
- অল্পবয়সে মেয়েদের শরীরে এইচডিএল বা ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ ছেলেদের তুলনায় বেশি থাকে।
- মাছের তেল হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। কারণ মাছের তেলের নানা ধরনের আনস্যাচুরেটেড (অসম্পৃক্ত) ফ্যাটি এসিড রক্তে কোলেস্টেরল, এল ডি এল ও ট্রাইগিসারাইডের মাত্রা কমায় এবং এইচ ডি এল বাড়িয়ে দেয়।

## লিপিড প্রোফাইল বলতে কি বোঝায়?

রক্তে কোলেস্টেরল নির্ণয় করার জন্য প্রাথমিকভাবে শুধু টোটাল কোলেস্টেরল (Total Cholesterol) পরীক্ষা করানো যেতে পারে। তবে যাদের হৃদরোগ আছে বা যারা হৃদরোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের নিচের সবগুলো টেষ্টই করাতে হয়, যাকে একত্রে লিপিড প্রোফাইল বলে।

- টোটাল কোলেস্টেরল (TC) - এরা উচ্চমাত্রায় রক্তে থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমান কমানোর সাথে সাথে হৃদরোগজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যায়।
- লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (LDL) বা খারাপ কোলেস্টেরল যা থাকে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ জুড়ে। এরাই চর্বিকে ধমনীর দেয়ালে জমা করে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে যা কিনা পরবর্তীতে হার্ট অ্যাটাক (MI) এবং স্ট্রোক (Stroke)- এর ঝুঁকি বাড়ায়।
- হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (HDL) বা ভাল কোলেস্টেরল - যা থাকে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জুড়ে। এরা ধমনী থেকে চর্বিকে বহন করে নিয়ে যায় লিভারে এবং পর্যায়ক্রমে দেহ থেকে চর্বি নিষ্কাশনে সাহায্য করে। এইচডিএল কোলেস্টেরল রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এইচডিএল দেহের জন্য উপকারী।
- ট্রাইগিসারাইড (TG) - এমন একটি কোলেস্টেরল, যাতে খুবই অল্প পরিমাণ লিপোপ্রোটিন থাকে। সাধারণত রক্তে সামান্যই ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে। বরং চর্বিকোষে ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি মাত্রায় জমা থাকে। রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- লিপিড প্রোফাইল রোগীর খালি পেটে বা অভুক্ত অবস্থায় করা উচিত।

## অবস্থাভেদে কাঙ্খিত লিপিড প্রোফাইল

### একজন সুস্থ মানুষের লিপিড প্রোফাইল কেমন হওয়া উচিত?

| | | |
|---|---|---|
| মোট কোলেস্টেরল | – | ২০০ মিলিগ্রামের কম |
| এইচডিএল কোলেস্টেরল | – | ৪০ মিলিগ্রামের বেশি |
| এলডিএল কোলেস্টেরল | – | ১৩০ মিলিগ্রামের কম |
| ট্রাইগিসারাইড | – | ২০০ মিলিগ্রামের কম |

### একজন হৃদরোগীর জন্য কাঙ্খিত লিপিড প্রোফাইল কেমন হওয়া উচিত?

| | | |
|---|---|---|
| মোট কোলেস্টেরল | – | ১২০ মিলিগ্রামের কম |
| এইচডিএল কোলেস্টেরল | – | ৫০ মিলিগ্রামের বেশি |
| এলডিএল কোলেস্টেরল | – | ৭০ মিলিগ্রামের কম |
| ট্রাইগিসারাইড | – | ১৫০ মিলিগ্রামের কম |

### ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে লিপিড প্রোফাইল কেমন হওয়া উচিত?

| | | |
|---|---|---|
| মোট কোলেস্টেরল | – | ১৫০ মিলিগ্রামের কম |
| এইচডিএল কোলেস্টেরল | – | ৪০ মিলিগ্রামের বেশী |
| এলডিএল কোলেস্টেরল | – | ১০০ মিলিগ্রামের কম |
| ট্রাইগিসারাইড | – | ১৫০ মিলিগ্রামের কম |

## ডিসলিপিডেমিয়ার কারণে কি কি রোগ হতে পারে?

একদিকে যেমন দেহের কার্যক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য এইচডিএল ও এলডিএল উভয় প্রকার কোলেস্টেরল এর সঠিক মাত্রা দেহে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে এদের মাত্রাস্বল্পতা বা মাত্রাতিরিক্ততা দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাড়াতে পারে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি। প্রায়ই রক্তে এই দুটো কোলেস্টেরলের যুদ্ধ চলে। এদের হার ও জয়ের উপর নির্ভর করে আমাদের ভাল-মন্দ থাকা।

- রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতার (Dyslipidaemia - ডিসলিপিডেমিয়া) কারণে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা যেতে পারে-
  - অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস
  - করোনারি আর্টারি ডিজিজ
  - স্ট্রোক
  - পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ
  - মেটাবলিক সিনড্রম
  - অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ

সুতরাং এসব কঠিন ও মারাত্মক রোগ দেখা দেয়ার আগেই নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে - কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা। আর না থাকলে যত দ্রুত সম্ভব তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

## রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যতা বজায় রাখার উপায় কি?

রক্তে কোলেস্টেরলের সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত এবং নিয়মিত রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত। মূলত দুই পদ্ধতিতে রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব -

- জীবনধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে
- ওষুধের মাধ্যমে

- জীবনধারার পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে - চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার, ধূমপান বর্জন, অতিরিক্ত ওজন কমানো এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা ইত্যাদি।
- গবেষণায় দেখা গেছে, মাছের তেলের লিনোলেনিক অ্যাসিড, ইকোসাপেন্টায়নিক অ্যাসিড, ডেকোসাহেক্সাজনিক অ্যাসিড রক্তে কোলেস্টেরলের এইচডিএল এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, কমায় এলডিএল ও ট্রাইগিসারাইডের মাত্রা।
- লেসিথিন নামক মোমজাতীয় এক ধরণের ফসফোলিপিড লিভারে তৈরি হয়, যা কোলেস্টেরলের এইচডিএল অল্প পরিমাণে বাড়াতে সাহায্য করে। এই লেসিথিন তৈরিতে সাহায্য করে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলিন ও ইসিটল। এগুলো পাওয়া যায় দানাশস্য, দুধ, ফল, মাংসে। কোলিন বিশেষ করে পাওয়া যায় গম, ব্রেন, লিভার ও কিডনিতে।
- তাই, খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেল জাতীয় খাবারের নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হয় তাদের এইচডিএল ও এলডিএল বাড়াবার বা কমাবার মতো কতটুকু।
- নিয়মিত ব্যায়াম করলে এইচডিএল - এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- যাঁরা নিয়মিত ধূমপান করেন, তাঁরা যদি ধূমপান ছেড়ে দেন তা হলেও এইচডিএল - এর মাত্রা বাড়তে পারে।

- শুধুমাত্র জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল পাওয়া না গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খেতে হবে।
- একজন সুস্থ মানুষের বেলায় রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরলের জন্য ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করে ওই ব্যক্তির সামগ্রিক হৃদরোগের ঝুঁকির মাত্রার উপর।
- যে সকল হৃদরোগীর ডায়াবেটিস আছে তাদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কোলেস্টেরল কমানোর জন্য একটি স্ট্যাটিন গ্রুপের ওষুধ খাওয়া শুরু করতে হবে। সেক্ষেত্রে রক্তে এলডিএল কোলেস্টেরলের এর পরিমাণ যাই থাকুক না কেন।
- এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানুষের দেহে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা বা ডিসলিপিডেমিয়া হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং এই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা গেলেই হৃদরোগ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর

# ডায়াবেটিস

## ডায়াবেটিসের সাথে হার্ট অ্যাটাকের সম্পর্ক কি?

- ডায়াবেটিস এবং করোনারী হার্ট ডিজিস বা হৃদরোগ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
- ডায়াবেটিক রোগীদের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর প্রধান কারণ হৃদরোগ। পাশাপাশি ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা ব্যয়ের সিংহভাগের জন্য দায়ী হৃদরোগ।
- ডায়াবেটিস (বিশেষ করে টাইপ-II) যা সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং এর সহযোগী শারীরিক সমস্যাগুলো (উচ্চরক্তচাপ ও ডিসলিপিডেমিয়া) হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর।
- বয়স বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস (বিশেষ করে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ) ডায়াবেটিসের মূল কারণ।
- বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আগামী ২০২৫ সালে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৩০০ মিলিয়নে। যা নাকি পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৫.৪ ভাগ।
- বর্তমানে হৃদরোগে যত মৃত্যু হয় তার শতকরা ১.৪ ভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ী ডায়াবেটিস। এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই মৃত্যুহার ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।
- করোনারী হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ২৮ জনের ডায়াবেটিস আছে। আর একিউট করোনারী সিনড্রম (Acute Coronary Syndrome) রোগীদের শতকরা ৭০ জনের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অস্বাভাবিক।
- অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, Acute Myocardial Infarction রোগীদের মধ্যে শতকরা ২০-২৫ জনেরই ডায়াবেটিস আছে। ডায়াবেটিস (টাইপ-II) অনেক আগে থেকেই হৃদরোগের অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
- ডায়াবেটিস পুরুষ এবং নারী উভয়েরই হৃদরোগের অন্যতম ঝুঁকির বিষয়। তবে মহিলাদের জন্য ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। ডায়াবেটিক নারীর হৃদরোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৮ গুণ বেশি, ডায়াবেটিক পুরুষদের ক্ষেত্রে যা মাত্র ৩ গুণ। সুতরাং ডায়াবেটিস যেমন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তার চেয়েও বেশী সতর্ক থাকতে হবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধে।

## ডায়াবেটিসের সাথে উচ্চ রক্তচাপের সম্পর্ক কি?

- ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ ডায়াবেটিস নেই এমন রোগীদের তুলনায় ১.৫ - ২ গুণ বেশী ।
- ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের সহাবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কেননা এরা ম্যাক্রোভাসকুলার এবং মাইক্রোভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় । ফলশ্রুতিতে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, করোনারী হার্ট ডিজিজ, কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিওর, স্ট্রোক এবং পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ এর ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

## হৃদরোগের ঝুঁকি নির্ধারণে রক্তে গ্লুকোজ এবং $HbA_1C$ - এর মাত্রাই মূল নির্ধারক

- সাম্প্রতিক বিভিন্ন নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, হৃদরোগের ঝুঁকি শুধুমাত্র ডায়াবেটিসের উপস্থিতির উপরই নির্ভর করে না, বরং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ডায়াবেটিসের পর্যায়ে প্রবেশ করা বা এই মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়তে থাকে ।
- এক সমীক্ষায় দেখা গেছে খাওয়ার ২ ঘন্টা পরে যাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমান শতকরা ৪.২ মিলিমোল (4.2 mmol/l) তাদের তুলনায় যাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ৭.৮ মিলিমোল (7.2 mmol/l) তাদের মধ্যে হৃদরোগের ঘটনা শতকরা ৫৮ ভাগ বেশি ।
- রক্তে গ্লুকোজের পাশাপাশি গ্লাইসেটেড হিমোগ্লোবিন বা $HbA_1C$ এর পরিমাণও হৃদরোগের ঝুঁকি নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে । United kingdom Prospective Diabetes Studies (UKPDS) এর নিরীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ১ ভাগ $HbA_1C$ বাড়ার সাথে সাথে হার্ট অ্যাটাকের হার বাড়ে শতকরা ১৪ ভাগ, স্ট্রোকের হার বাড়ে শতকরা ১২ ভাগ এবং কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিউর (CHF) বাড়ে শতকরা ১৬ ভাগ ।

## অভূক্ত অবস্থার চেয়ে খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজ হৃদরোগের ঝুঁকি নির্ধারণে বেশী ভুমিকা রাখে

- সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অভূক্ত অবস্থার চেয়ে খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা $HbA_1C$ -এর মাত্রার সাথে বেশি সামঞ্জস্যপুর্ণ ।
- খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অভূক্ত অবস্থার চেয়ে বেশি থাকে ।
- অভূক্ত অবস্থায় গ্লুকোজের মাত্রা হৃদরোগ সংক্রান্ত রোগের সাথে ততটা সম্পর্কিত নয় যতটা সম্পর্কিত খাওয়ার পরে গ্লুকোজের মাত্রা ।
- সম্প্রতি অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ডায়াবেটিসহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের হার্ট অ্যাটাকের সময় গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকে, তাদের হাসপাতালে অবস্থানকালে মৃত্যুর হার চার গুণ বেশি ।
- অন্য আরেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাওয়ার পরে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ক্যারোটিড এথেরোস্ক্লেরোসিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকির সাথে অধিক সম্পর্কিত ।
- সুতরাং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা এবং $HbA_1C$ - এর মাত্রাবৃদ্ধি নতুন করে হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন বাড়ায় তেমনি হৃদরোগের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয় এবং এই আন্ত:সম্পর্ক ডায়াবেটিসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত নয় ।

## ডায়াবেটিস নির্ণয়ের উপায়সমূহ কি ?

- ডায়াবেটিসের লক্ষণসমূহের উপস্থিতি যেমন : অতিরিক্ত প্রস্রাব হওয়া, অতিরিক্ত ক্ষুধা, ওজন কমে যাওয়া এবং যে কোন সময়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ 200mg/dl (11.1 mmol/l) বা এর বেশি হলে ।

  অথবা

- অভুক্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অর্থাৎ FPG (Fasting Plasma Glucose) 126mg/dl হলে । এখানে অভুক্ত বলতে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা কোন রকম ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা বোঝায় ।

  অথবা

- WHO বর্নিত নিয়ম অনুযায়ী ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘন্টা পর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অর্থাৎ 2 hours after plasma glucose 200mg/dl (11.1mmol/l)

## ডায়াবেটিস প্রতিরোধ অথবা বিলম্বিত করার উপায় সমূহ

সাধারণত দুই উপায়ে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব

- জীবনধারা পরিবর্তন (Lifestyle modification) ।
- ওষুধ প্রয়োগ (Pharmacological interventions) ।

## নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী মেনে চললে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ অথবা বিলম্বিত করা সম্ভব

- যারা ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে, তাদেরকে ওজন কমানো বা নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন কাজ করার সুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- যারা IGT (Impaired Glucose Tolerance) এবং IFG (Impaired Fasting Glucose)-তে ভুগছেন তাদেরকে ওজন কমানোর পরামর্শ দিতে হবে এবং সেই সাথে ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- উপরোক্ত পরামর্শগুলো সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রতি ১ বা ২ বছর অন্তর অন্তর ডায়াবেটিস দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
- হৃদরোগের অন্যান্য ঝুঁকি সমুহ যেমন : ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে এর চিকিৎসা করতে হবে।
- ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদেরও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে উপরে উল্লিখিত উপায় সমুহ (যেমন- জীবনধারা পরিবর্তন ও ঔষধ প্রয়োগ) মেনে চলতে হবে। সেই সাথে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি হৃদরোগের অন্যান্য ঝুঁকিসমূহও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

| ডায়াবেটিক রোগীর বিভিন্ন প্যারামিটার | কাঙ্খিত মাত্রা |
|---|---|
| ব্লাড সুগার (Glycemic Control) | |
| গ্লাইসেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA1C) | -<7.0% |
| অভূক্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ (FPG) | -90-130mg/dl(5.0-7.2 mmol/l) |
| খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ (PPG) | -<180 mg/dl (<10.0 mmol/l) |
| ব্লাড প্রেসার (BP) | <130/80 mmHg |
| লিপিডস্ (Lipids) | |
| এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল (LDL) | -<100 mg/dl (<2.6 mmol/l) |
| ট্রাইগিসারাইড (Triglycerides) | -<150 mg/dl (<1.7 mmol/l) |
| এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরল (HDL) | ->40 mg/dl (>1.1 mmo/l) |

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর

# অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস

## অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের সাথে হার্ট অ্যাটাকের সম্পর্ক কি?

- অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টরের মতো খাওয়া দাওয়াও হাট অ্যাটাকের জন্য অনেকটাই দায়ী। যেমন- গরুর মাংস, খাসীর মাংস বা শূকরের মাংস অর্থাৎ রেড মিট হার্টের রোগ ডেকে আনতে পারে।
- রেড মিট ও অন্যান্য চর্বি জাতীয় খাবার খেলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং করোনারি আর্টারির ভিতরে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমতে জমতে আর্টারি সরু হতে থাকে। বলাই বাহুল্য, এটাই করোনারি আর্টারি ডিজিজের অন্যতম কারণ।
- আগে ধারণা ছিল চল্লিশ বছর বয়সের পরে রেড মিট খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যেসব পরিবারে হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেছে সেই পরিবারের সদস্যদের একদম অল্প বয়স থেকেই রেড মিট না খাওয়া ভাল ।
- রেড মিটের মতোই হার্টের অসুখের জন্য দায়ী চকোলেট, চিনি ও অতিরিক্ত মিষ্টি এবং কোল্ড ড্রিংক্স। অবশ্য মাঝেমধ্যে একটা দুটো মিষ্টি খেলে যে হার্ট অ্যাটাক হবে তা কিন্তু নয়। মিষ্টি-চকোলেট আর কোল্ড ড্রিংক্স পরোক্ষভাবে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়। নিয়মিত এইসব খেলে অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণের কারণে ওজন বাড়তে থাকে। আর এই বাড়তি ওজন হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে।
- রঙ্গিন পানীয় আর মিষ্টি হার্টের শত্রু হলেও রঙ্গিন ফল আর শাকসবজি কিন্তু হার্টের পক্ষে উপকারী। কারণ গাজর, টমেটো আর সবুজ শাক-পাতা, মটরশুঁটিতে থাকে বিটা-ক্যারোটিন যা হার্টের অসুখ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সবুজ, হলুদ, কমলা শাক-সবজিতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন ধমনির মধ্যে কোলেস্টেরল জমতে বাধা দেয়। এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ফলমূল সবুজ শাকসবজি খাবেন বেশি করে।

- আজকাল আমাদের এই অতি ব্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ফাস্ট ফুড। হার্টের পক্ষে এই ফাস্ট ফুড কিন্তু একদমই ভাল নয়। রোল, চাওমিন, চিপসের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অনেকটা ফ্যাট আমাদের শরীরে চলে যায় - যা শুধু হার্টের পক্ষেই নয় পেটের পক্ষেও খারাপ।

- একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ২৫-৩০ গ্রামের বেশি ফ্যাট খাওয়া উচিত নয়। আর এই পরিমাণ ফ্যাট আমরা রোজকার খাবারের যেমন : ডাল, মাছ, তরকারি, ডিম ইত্যাদির মধ্যেই পেয়ে যাই।

- যাদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক ফ্যাক্টর নেই তাঁরা ২০-২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ঘি মাখন বা চিজ খেতেই পারেন। তবে রোজ রোজ একগাদা করে নয়। ফাস্ট ফুডের মতো আজকাল ছোট বড় সকলেই কেক, পেস্ট্রি, চকোলেট, আইসক্রিম খেতে পছন্দ করেন। এতেও কিন্তু সেই বাড়তি ফ্যাটের সমস্যা। খুব মুখরোচক হলেও এগুলো খাওয়া খুব কমিয়ে দিন। একই কথা চিপস্, চানাচুর বা তেলেভাজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে একেবারে অচ্ছুত করে না রেখে মাঝে মাঝে খাওয়া যেতে পারে। তবে হৃদরোগী হাইপারলিপিডিমিয়া ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের এগুলি একদম খাওয়া উচিত হবে না।

- ডিম একটা ভাল প্রোটিন, দামেও কম, হজম করাও সহজ, কিন্তু মুশকিলটা হল ডিমের কুসুমে। তাই যাঁদের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তাদের ডিমটা কম খাওয়াই ভাল, সপ্তাহে দুটোর বেশি নয়।

- সম্প্রতি আমেরিকায় ২ লক্ষ ৮৫ হাজার মানুষের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যারা অতিরিক্ত দৈনন্দিন খাবারের অর্ধেক হোল গ্রেইন বা দানাযুক্ত খাবার গ্রহণ করেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ কম। অন্যদিকে যারা দিনে ৫ পরিবেশনার মধ্যে অন্তত ১ পরিবেশনা দানাযুক্ত গ্রহণ করেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি। সুতরাং দৈনন্দিন খাবারের ক্ষেত্রে বেশি করে দানাযুক্ত খাবার খাওয়ার ব্যাপারে নজর দিতে হবে।

## হৃদহিতকর খাদ্যাভ্যাস বলতে কি বোঝায়?

- সুস্থতার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস জরুরী। এটা আরো বেশী প্রযোজ্য হৃদরোগীদের বেলায়। নিয়মিত ঔষধ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস আর সুষ্ঠু জীবনধারা এই তিনটিই হল হৃদরোগীদের জীবনমন্ত্র।
- কিছু কিছু খাবার আছে যা হৃদরোগীদের জন্য অবশ্যই বর্জনীয়। আবার কিছু খাবার আছে যা হৃদরোগীদের জন্য উপকারী। সুতরাং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে এবং হার্ট অ্যাটাকের পর সুস্থ থাকতে আমাদের পরিচিত খাবারগুলিকে কয়েকটি গ্রুপে বা দলে ভাগ করেছি।

### গ্রুপ-১ ছোঁবেন না

- সিগারেট, সাদাপাতা, জর্দা, মদ অথবা অন্য কোন নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে সব সময় দূরে থাকবেন।

### গ্রুপ-২ খাবেন না

- লাল মাংস অর্থাৎ গরু বা খাসীর মাংস।
- চিংড়ি মাছ, মাখন, ঘি, ডালডা, কাঁচা লবণ এবং লবণ দেওয়া খাবার (যেমন- চিপ্‌স, আচার)।
- কোকা-কোলা, পেপসি বা অন্য যে কোন কোমল পানীয়।
- কেক, পেস্ট্রি, আইসক্রীম, চকলেট, পনির ইত্যাদি।
- এই খাবারগুলোতে প্রচুর কোলেস্টেরল থাকে, তাই এসব খেলে রক্তচাপ তথা হৃদরোগের আশংকা বাড়ে ।

### গ্রুপ-৩ কম খাবেন

এই দলের খাবারগুলোকে খুব ইচ্ছে হলে খেতে পারেন। তবে যত কম খাওয়া যায় তাই ভাল।

- এই দলে আছে সম্পূর্ণ ডিম যা সপ্তাহে একদিন, বড় জোর দু'দিন খাওয়া যেতে পারে।
- ফার্মের মুরগীর মাংস না খেলেই ভাল। এগুলোতে প্রচুর কোলেস্টেরল থাকে।
- তেলে ভাজা খাবার যেমনঃ চমুচা, পুরি, পিয়াজু, লুচি, সিঙ্গারা ইত্যাদি না খেলেই ভাল।

- ফুলক্রীম বর্জন করতে পারলে ভাল। ননী তোলা লো-ফ্যাট দুধ খাওয়া যায়। দধি, বোরহানি, লাচ্ছি, কফি-এসব না খেলেই ভাল।
- চিনি, মিষ্টি, জ্যাম, জেলী পরিমিত খাবেন।
- সবজির মধ্যে গাজর, আলু, মিষ্টি কুমড়া, সীমের বিচি ইত্যাদিতে ক্যালরি একটু বেশী থাকে। এগুলো তাই একটু কম খাবেন।
- চা খেতে পারেন।

**গ্রুপ-৪ বেশী করে খাবেন**

- এই গ্রুপের সদস্য হল শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি। এসবে ভিটামিন তো আছেই সাথে আছে আঁশ বা ফাইবার যা রক্ত থেকে কোলেস্টেরল দূর করে।
- সবরকম ফলই খাবেন। বিশেষত কলা, পেঁপে, ডাব ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য খুব উপকারী। পেয়ারা, বাতাবী লেবু, আমড়া, আমলকি, জাম, জলপাই ইত্যাদি খুবই উপকারী ফল। এসব ফল যত পারেন খাবেন। ফলের খোসা এবং বীচিসহ যদি খাওয়া যায় তবে আরো ভাল।
- ছোট মাছ বেশী করে খাবেন।
- কুসুম ছাড়া ডিম খেতে পারবেন প্রতিদিন।

**শেষ কথা**

- খাবারকে উপভোগ করতে হলে খাবারের মেন্যুতে বৈচিত্র আনতে হবে। খাবার সে যতই ভাল হোক, একই রকম খাবার বার বার খেলে একঘেঁয়েমি আসে।
- সপ্তাহে অন্তত একদিন শরীরের ওজন মেপে দেখা উচিত। অতিরিক্ত ওজন কমালে রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল এবং ক্ষতিকর ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমে।
- নিয়মিত ব্যায়ামের (যেমন : হাঁটা, সাঁতারকাটা, সাইকেল চালনা ইত্যাদি) অভ্যাস করুন। ব্যায়াম শরীরের ক্যালোরি খরচ করার মাধ্যমে অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে। তবে বুকে ব্যথা বা হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস থাকলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর

# অতিরিক্ত ওজন

## অতিরিক্ত ওজন বা মেদভূড়ির সাথে হৃদরোগের সম্পর্ক কি?

- অতিরিক্ত ওজন বা স্থুলতা আধূনিক জীবন-যাপনের অন্তরায় স্বরূপ। অতিরিক্ত ওজনের ফলে স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল গড়ে ৯ বছরের মত কমে যায়।
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন - হৃদরোগ, ডায়াবেটিস (টাইপ-II), উচ্চ রক্তচাপ, মাত্রাতিরিক্ত চর্বি এবং স্ট্রোকের অন্যতম কারণ এবং অতিরিক্ত ওজন এ সমস্ত রোগে মৃত্যুর ঝুঁকিও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।
- শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন জনিত সমস্যা পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে যেমন: ইউরোপ, আমেরিকায় ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে ২ কোটি ২০ লক্ষ শিশু (যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে) মেদভূঁড়ি ও অতিরিক্ত ওজন জনিত সমস্যায় ভূগছে।
- অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাটা বর্তমানে শুধু উন্নত বিশ্বেরই নয়, স্বল্পোন্নত দেশেও প্রভাব ফেলেছে। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে এই শিশুদের মধ্যে হৃদরোগ ও স্ট্রোক-এর হার বহুলাংশে বেড়ে যাবে, যা এদের আয়ুকেও কমিয়ে দিবে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩ জন শিশুর মধ্যে ১ জন, যারা ৫-১৪ বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ওজনে ভুগছে। গত ৩ বছর আগে এই হার ছিল বর্তমানের অর্ধেক। চীনে প্রতি ৫ জন স্কুলগামী শিশুর মধ্যে ১ জন মোটা। থাইল্যান্ডে ৬-১২ বছর কিশোরদের মধ্যে এ রোগ দুই বছরে ১২.২% থেকে বেড়ে ১৫.৬% হয়েছে।
- সম্প্রতি ৪-১৫ বছরের ১৩০ জন অতিরিক্ত ওজন সম্পন্ন শিশুর মধ্যে পরিচালিত এক জার্মান সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বি.এম.আই. ১-২ কমানোর মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। অপর দিকে ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই সমস্ত শিশুদের মধ্যে টাইপ-II ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। মোটা শিশুদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্যান্য শিশুদের থেকে ৩-৫ গুণ বেশি।

- অতিরিক্ত ওজনের কারণে আপনি যদি হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে বা হার্ট অ্যাটাকের আক্রান্ত হয়ে থাকেন তবে সহজেই তা দু'ভাবে যাচাই করা যায় ।
    - কোমরের মাপ
    - বিএমআই
- **কোমরের মাপ :** মহিলাদের ক্ষেত্রে কোমরের মাপ ৮৮ সে:মি: এর বেশি এবং পুরুষের ক্ষেত্রে কোমরের মাপ ১০২ সে:মি: এর বেশি হলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়বে ।
- **বিএমআই :** বিএমআই ৩৫ এর উপরে থাকলে তাদেরকে আমরা অতিরিক্ত ওজন সম্পন্ন বা স্থুল বলব, তবে বিএমআই ২৫ এর বেশি হলেই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ক্রমশ: বাড়তে থাকবে ।

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর

# অপর্যাপ্ত

শারীরিক শ্রম

## অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম ও হার্ট অ্যাটাক

- হার্ট অ্যাটাক এক মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি। আর অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম এই হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম কারণ। ক্রমবর্ধমান ফাস্টফুডের ব্যবহার এবং শরীর চর্চা না করার কারণে এশিয়ায় হৃদরোগের প্রকোপ মারাত্মকভাবে বাড়ছে।
- যদিও প্রকৃতিগতভাবেই শিশুরা চঞ্চল ও উদ্যোমী হয়ে থাকে, তারপরও দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুই তাদের সু-স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রম করেনা। এসকল শিশুরাই বড় হয়ে মোটা হয়ে যায় এবং পরবর্তি সময়ে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে দ্বিগুণ হয়।
- বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের কম বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে, তাদের পরবর্তি ১০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি।
- বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ কর্মস্থলে এখন অবসর সময়ে হালকা শারীরিক শ্রমের সুযোগ নেই বললেই চলে, যা সুস্থ হৃদরোগ মুক্ত জীবন-যাপনে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। তাই একটি সুন্দর স্বাস্থ্য এবং হৃদরোগমুক্ত জীবনের জন্যে কর্মস্থলে বিরতির কিছু সময় হলেও শারীরিক শ্রমে ব্যয় করা উচিত।
- বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে শারীরিক কর্মঠ ব্যক্তিদের তুলনায় অকর্মঠ ব্যক্তিদের মধ্যে হৃদরোগের হার দ্বিগুণ এবং নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম হৃদরোগের কারণে মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে।
- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম যথাযথই শরীরের ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, প্লাজমা লিপিডস, গ্লুকোজ সহনীয়তা (Glucose Tolerance) এবং ইনস্যুলিন অসংবেদনশীলতা (Insulin Resistance) জনিত হৃদরোগ থেকে মুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তদুপরি সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম বিশেষ প্রভাব রেখে থাকে।

## অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রমের কারণ সমূহ

- ক্রমবর্ধমান নগরায়ন (গ্রামে পায়ে হাঁটা, ক্ষেতে-খামারে কাজ, গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু, দড়ি-লাফানো, সাঁতার, নৌকা বাইছ ইত্যাদির স্থান দখল করেছে নগরের আটপৌরে জীবন)।
- অতিরিক্ত ঘুম।
- শহরে পুকুর, খেলার মাঠের অভাব।
- টেলিভিশন এবং কম্পিউটারে অতিরিক্ত সময় ব্যয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শারীরিক শিক্ষার অভাব।
- বয়স্ক ব্যক্তি বিশেষ করে যাদের মধ্যে হৃদরোগের অন্যান্য ঝুঁকি বিদ্যমান।
- সর্বোপরি অশিক্ষা এবং অসচেতনতা।
- টিনএজার অর্থাৎ কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা যদি দীর্ঘসময় টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা শারীরিক পরিশ্রম কম করে তবে মোটা-চিকন নির্বিশেষে তারা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকির মধ্যে থাকবে।

## অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম প্রতিকারের উপায়

- নিয়মিত শারীরিক শ্রম বা ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
- শিশু-কিশোরদের জন্য পরিবারে প্রতিদিন হালকা মানের কায়িক শ্রমের জন্য কিছু সময় নির্ধারিত রাখুন।
- শারীরিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে শিশুকে কোন কাজে যুক্ত বা কাজ থেকে বিরত রাখবেন না। শিশুর শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে উৎসাহিত করুন।
- শিশুকে সেই ধরনের খেলাধূলায় উৎসাহিত করুন, যা থেকে সে আনন্দ পায়।
- শিশুর কোন ধরনের কাজের পুরস্কার হিসেবে খাদ্যাবস্থার পরিবর্তে কায়িক শ্রম হয় এই ধরনের খেলনা উপহার দিন।
- বেশী সময় টেলিভিশন দেখা থেকে বিরত থাকুন এবং পরিবারে অন্যান্যদেরকে নিরুৎসাহিত করুন।
- অফিস-আদালতে বা কম্পিউটারে একটানা বসে না থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিরতি নেয়া এবং সেই সময় হালকা মানের ব্যায়াম করা।
- পাড়া-মহল্লায় খেলার মাঠ এবং ব্যায়ামাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ব্যায়াম এবং তার সুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- সাধারণত প্রতিবারে ৩০-৪০ মিনিট করে সপ্তাহে ৪-৫ দিন ব্যয়ামই যথেষ্ট। এই ৩০-৪০ মিনিটের মধ্যে প্রথম ৫-১০ মিনিট হচ্ছে ব্যায়ামের প্রাথমিক অবস্থা (warm up phase)। সেই সময়ে হালকাভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে ব্যয়াম আরম্ভ করতে হবে এবং পরবর্তি ২০-৩০ মিনিট (aerobic phase) ব্যায়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে। শেষের ৫-১০ মিনিটে (cool down phase) ব্যায়ামের তীব্রতা কমিয়ে পূর্বের স্থিতি অবস্থায় আসতে হবে। অবশ্য ব্যায়ামের এই সময়কাল বাড়ালে সপ্তাহে ২-৩ দিন ব্যয়ামই যথেষ্ট।

- পূর্বে ব্যায়াম করেনি এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে খুব হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে শুরু করতে হবে।
- ইউরোপিয়ান গবেষকরা দেখিয়েছেন, অন্য কোন হৃদরোগের ঝুঁকি থাকুক আর নাই থাকুক নিয়মিত মাঝারি ধরনের শারীরিক পরিশ্রম হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।
- যারা করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা হৃদরোগে ভুগছেন তাদের ব্যায়ামের প্রকৃতি, তীব্রতা বা সময়কাল কতটুকু হবে তা ই.টি.টি. বা ট্রেডমিল টেস্ট (ETT or Treadmill test) -এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করবেন একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। তবে সাধারণত স্ট্যাবল এনজাইনা পেক্টরিস (Stable Angina Pectoris) -এর রোগীরা ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত ওষুধ নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে।
- ব্যায়াম অবশ্যই প্রাথমিক অবস্থায় হালকাভাবে শুরু করে পর্যায়ক্রমে তীব্রতা বাড়াতে হবে। যতটুকু পর্যন্ত গেলে বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হয় তার পূর্বেই ব্যায়ামের মাত্রা কমিয়ে তা শেষ করতে হবে। হৃদরোগীদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার বেশী ব্যায়াম করা সমীচীন নয়।
- সদ্য হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন রোগীদের অথবা যাদের হার্টের এনজিওপ্লাস্টি (PTCA) এবং বাই-পাস অপারেশান (CABG) হয়েছে তাদেরকেও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বা কার্ডিয়াক সার্জনের পরামর্শ মত নির্ধারিত ব্যায়াম শুরু করতে হবে।

হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক ফ্যাক্টর

# অতিরিক্ত মদ্যপান এবং দৈহিক উচ্চতা

## হার্ট অ্যাটাকের সাথে মদ্যপানের সম্পর্ক কি?

- বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিয়ম করে সামান্য পরিমাণে (এক পেগ বা তার কম) মদ্যপান হার্টকে ভাল রাখে।
- অল্প পরিমাণে অ্যালকোহল রক্তের HDL - এর মাত্রা বাড়িয়ে হার্টকে সুরক্ষিত রাখে। অন্যদিকে স্নায়ু কিছুটা শিথিল হয় বলে ঘুমটাও ভালো হয়।
- কিন্তু বেশী পরিমানে অ্যালকোহল শরীরের অনেকরকম ক্ষতির সাথে হার্টের জন্যও ক্ষতিকর।
- অতিরিক্ত মদ্যপান উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
- সুতরাং অতিরিক্ত মদ্যপান অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত।

## দৈহিক উচ্চতা হার্ট অ্যাটাকের একটি রিস্ক ফ্যাক্টর

- সর্বনিম্ন উচ্চতার একজন পরিণত মানুষের হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হার একজন লম্বা মানুষের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী।
- বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাটো মানুষের করোনারি আর্টারি ছোট থাকে এবং তার ডায়ামিটার বা ব্যাস তুলনামূলকভাবে কম থাকে। ধারণা করা হয়, হার্ট অ্যাটাকের অন্যান্য প্রচলিত ঝুঁকির মধ্য থেকে তুলনামূলক ছোট করোনারি আর্টারির তাড়াতাড়ি বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর

# সামাজিক চাপ ও মানসিক দুশ্চিন্তা

## সামাজিক চাপ ও মানসিক দু:শ্চিন্তা হার্ট অ্যাটাকের জন্য ঝুঁকির কারণ

- আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজির জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে ৫১৬ জন হৃদরোগীর উপর গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন থাকেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকির হার কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ। তবে যারা প্রথম দিকে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন কিন্তু পরবর্তীতে দুশ্চিন্তা কমিয়ে আনতে পারেন বা আস্তে আস্তে প্রশমন করতে পারেন তাদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও কমে যায়। সুতরাং সমিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের দৈনন্দিন চিকিৎসার ক্ষেত্রে হৃদরোগীদেরকে অবশ্যই দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে এবং কিভাবে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হবে।
- জার্নাল অব এপিডেমিওলজি এন্ড কমিউনিটি হেলথ এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, যারা নিরাপত্তাহীনতা বা অবহেলার শিকার হচ্ছেন বা এই বোধে ভুগছেন তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের হার অন্যদের তুলনায় বেশি।
- ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে পরিচালিত ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে - "আমি প্রায়শই অবিচারের শিকার হচ্ছি" এই বোধে যারা ভুগছেন তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের হার শতকরা ২৮ থেকে ৩৬ ভাগ।
- সাধারণত যারা বর্ণ বৈষম্য বা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তাদের মধ্যেই এই বোধটা বেশি এবং তাদের হৃদস্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আরও বেশি যত্নবান হওয়া দরকার ।
- অবসর নেয়ার ১০ বছর আগে মাসিক আয় যদি অবসর নেয়া পর্যন্ত না বাড়ে অথবা অপরিবর্তিত থাকে তবে অবসর নেয়ার পর তাদের হৃদরোগের আশংকা বেড়ে যায়।
- গবেষকরা আরও দেখিয়েছেন যে, যাদের আশেপাশে বসবাসকারী লোকজন কম সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন তবে তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক এবং হার্ট অ্যাটাকজনিত মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

- এ কথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে মন শান্ত থাকলে অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর থাকা সত্ত্বেও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কম ।

- অ্যাকিউট স্ট্রেস ও ক্রনিক স্ট্রেসের মধ্যে মূলত ক্রনিক স্ট্রেসই হৃদরোগের জন্য দায়ী।
- প্রত্যেক মানুষের জীবনে কোন না কোন সময়ে কিছু বিশেষ কারণে অ্যাকিউট স্ট্রেস দেখা দেয়। কখনও কেউ উদ্বিগ্ন হয় রেজাল্টের জন্য - কখনও আবার ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে না পারার চিন্তায়, ব্যাপারটা সাময়িক। মাঝে মধ্যে এই ধরনের স্ট্রেস অস্বাভাবিক নয়।
- ক্রনিক স্ট্রেসের কারণেই সমস্যা বেশী হয়। সংসারে নিত্যদিনের ঝগড়া, অশান্তি, অফিসে সাংঘাতিক কাজের চাপ, পান থেকে চুন খসলেই বসের বকুনি বা প্রোমোশন আটকে যাওয়ার ভয়। এরকম অল্প অল্প স্ট্রেস দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে এক বিশেষ ধরনের নিউরোট্র্যান্সমিটার নিউরোহরমোন - এপ্রিনেফ্রিন ও নরএপি-নেফ্রিনের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ বিভিন্ন নিউরোহরমোনের স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য দায়ী। আর এর ফলেই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা যায় বেড়ে।
- টাইপ-এ (Type-A) পারসোনালিটির মানুষদেরও হৃদরোগের সম্ভাবনা প্রবল। এরা অহরহ টাকা আর খ্যাতির পেছনে দৌড়ান বা অকারণে টেনশন করেন।
- অতিরিক্ত টেনশন ও স্ট্রেস মানুষের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কাজকর্ম বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অ্যাথেরোস্কেরোসিসের গতি বেড়ে যায়, হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, আর্টারির Spasm এবং রক্তচাপও বাড়তে থাকে। এরকম চলতে থাকলে হৃৎপিন্ডে রক্ত চলাচল বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।
- মানসিক চাপ কমাতে নিয়মিত যোগাসন ও ধ্যান খুবই কার্যকর। নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে বা রাতে নির্জনে বসে ধ্যান করলে মন শান্ত হয়। সারাদিনের কাজকর্মের পর সন্ধেবেলা গান শোনা বা আড্ডা দেওয়া, খেলাধুলা করা, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া যেটা ভাল লাগে করুন। মাঝেমধ্যে এক ঘেষে পরিবেশ ছেড়ে বনে, পাহাড়ে বা সমুদ্রে বেড়িয়ে আসুন। দুশ্চিন্তা আর টেনশন মুক্ত হবেন।
- ইটালিয়ান গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, কর্মক্ষেত্রে stress management program চালু করলে হার্টের উপর চাকুরিজনিত মানসিক চাপের প্রভাব অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

## পুরুষের বন্ধ্যাত্ব হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকির কারণ

- মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যতটা উন্নতি হচ্ছে, তার চেয়েও দ্রুতহারে হৃদরোগ বিশেষতঃ হার্ট অ্যাটাকের হার বেড়ে চলছে।
- উন্নত দেশের জনগণ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মতো দেশ, যার জনসাধারণ কেবল উন্নতির স্বপ্ন দেখে, তাদেরকেও বিপুল সংখ্যায় হার্ট অ্যাটাকে মরতে হচ্ছে। একইভাবে পুরুষের বন্ধ্যাত্বও বেড়ে চলছে।
- আমাদের দেশের প্রায় ১০% পুরুষ বন্ধ্যাত্বে ভূগছে। আর আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, পুরুষের বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।
- পুরুষের বন্ধ্যাত্ব বা যৌনক্রিয়ায় অক্ষমতা, হৃদপিন্ডের রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়া বা হার্ট অ্যাটাক হবার মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির প্রায় ২ বা ৩ বছরের মধ্যে দেখা যায়।
- তাই যে সব পুরুষ হৃদরোগের ঝুঁকির মধ্যে আছেন এবং অন্যদের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেবার পর অতিসত্বর হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।
- পৃথিবীতে ৩২২ মিলিয়ন পুরুষ এ সমস্যায় ভুগছে। এটি বয়স, হৃদরোগের অন্যান্য ঝুঁকিসমূহ (পারিবারিক ইতিহাস, দৈহিক স্থূলতা, ধূমপান, শারীরিক শ্রমবিমুখতা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও রক্তের কোলেস্টেরলের অসামঞ্জস্য) ইত্যাদির সঙ্গে একই সুতোয় গাঁথা।
- পুরুষাঙ্গ যথেষ্ট উত্তেজিত না হওয়াটা মূলত রক্তনালীর সমস্যা। এটা অন্যান্য রক্তনালীর সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। হৃৎপিন্ডের রক্তনালীর অসুখ হয়েছে এমন পুরুষের ৭৫% বন্ধ্যাত্বে ভূগছে। যাদের হৃৎপিন্ডের একটি রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে তাদের ২২%, যাদের দুটিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে তাদের ৫৫% এবং দুয়ের অধিক রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে তাদের ৬৫%-এর উপরে বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় আক্রান্ত।
- আর বন্ধ্যাত্ব ও হৃদরোগ আছে এমন পুরুষের ৯৩% বলেছেন যে, তাদের ২ বছর আগে অ্যানজিনা হয়েছিল।

## নারীদের উপর হার্ট অ্যাটাকের প্রভাব কতটুকু ?

- সারা পৃথিবীতে যত নারীর মৃত্যু হয় তার এক তৃতীয়াংশের কারণ হার্ট অ্যাটাক। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই চিত্র আরও আশংকাজনক।
- সকল নারী মৃত্যুর অর্ধেকই মারা যায় হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের কারণে।
- সাধারণত মহিলারা হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন পুরুষের চেয়ে প্রায় ১০ বছর পরে।
- ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোনের প্রতিরোধী ক্ষমতার কারণে ঋতুবতী মহিলাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কম থাকে।
- নারীদের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি সংক্রান্ত এক গবেষণায় দেখা গেছে লিপিড প্যারামিটারের উপর মেনোপজ -এর স্বাধীন ভূমিকা রয়েছে যা কিনা হৃদরোগের ঝুঁকিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।
- বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যেসব মেয়েরা অল্প বয়সে মোটা হয়ে যায় তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ওজনের মেয়েদের তুলনায় বয়স বাড়ার সাথে সাথে হৃদরোগের রিস্কফ্যাক্টরগুলো বেশী করে পরিলক্ষিত হয়।
- যেসব মেয়েরা নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রনের বড়ি ব্যবহার করেন ও তার সঙ্গে ধূমপান বা মদ্যপান করেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় বেশী।
- মেনোপজের পর ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ কমতে থাকায় হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে।
- অনেক বেশী পরিমাণে কফি পান করলেও মহিলাদের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকিতো বাড়েইনা বরং কিছু কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে কফি পান হৃদরোগ থেকে হার্টকে রক্ষা করে।
- ডায়াবেটিক নারীর হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা ৮ গুণ বেশী, ডায়াবেটিক পুরুষদের ক্ষেত্রে যা মাত্র ৩ গুণ। সুতরাং ডায়াবেটিক নারীদের ডায়াবেটিস যেমন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তার চেয়েও বেশী সতর্ক থাকতে হবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধে।

- মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া মধ্যবয়সী নারীদের মধ্যে প্রিহাইপার-টেনশন সাধারণত বেশি দেখা যায় এবং আমেরিকান গবেষকদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, তাদের হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, হার্ট ফেইলিউর তথা সামগ্রিকভাবে হৃদরোগের ফলে মৃত্যুর আশংকাও বেশি।
- সাধারণত গর্ভাবস্থায় হার্ট অ্যাটাক কম হয়ে থাকে। কিন্তু যাদের পারিবারিকভাবে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল আছে, যারা স্থুলকায়, ধূমপান করেন, ডায়াবেটিস আছে এবং তুলনামূলকভাবে যারা বেশী বয়সে গর্ভধারণ করেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে। আবার এওরটিক বা করোনারি আর্টারি ডিসেকশনের কারণেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।
- মনে রাখতে হবে, গর্ভাবস্থায় হার্ট অ্যাটাক হলে থ্রম্বোলাইটিক (স্ট্রেপ্টোকাইনেস) ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত নয়।
- যাদের হার্টের কার্যক্ষমতা কম (Ejection fraction < 50) তাদেরকে গর্ভধারণে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

হার্ট অ্যাটাকের জটিলতা

# হার্ট ফেইলিউর

੮੧

## হার্ট ফেইলিউরের কারণ

সাধারণত: যে যে কারণে হার্ট ফেইলিউর হয় তা হলো -

- করোনারি আর্টারি ডিজিজ - যে সকল রক্তনালী দিয়ে হার্টের মাংসপেশীতে রক্ত সঞ্চালিত হয় সেগুলো যদি কোন কারণে সরু বা বন্ধ হয়ে যায় ।
- উচ্চ রক্তচাপ ।
- পূর্বে হার্ট অ্যাটাক বা মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান হয়ে থাকলে ।
- হার্টের ভাল্বের ত্রুটি বা রোগ থাকলে ।
- রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ বা বাত জ্বর ।
- হার্টের মাংসপেশীর রোগ-যাকে বলে কার্ডিওমায়োপ্যাথি ।
- জন্মগতভাবে হার্টে যদি কোন ত্রুটি থাকে বা জন্মগত হৃদরোগ ।
- হার্টের ভাল্ব বা মাংসপেশীর সংক্রমণ যাকে যথাক্রমে এন্ডোকার্ডাইটিস এবং মায়োকার্ডাইটিস বলে ।
- কিছু অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন ।
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন বা স্থূলতা ।
- ডায়াবেটিস ।
- মারাত্মক ফুসফুসের রোগ ।
- থাইরয়েড হরমোন জনিত সমস্যা ।
- বিষ জাতীয় দ্রব্য যেমন-এলকোহল, কিছু বিশেষ কেমোথেরাপির ওষুধ ইত্যাদি ।

## শ্বাসকষ্ট থেকে কি হার্ট ফেইলিউর হতে পারে?

- বক্ষব্যাধি এবং হৃদরোগ বিষয় দুটো আলাদা বিষয়। যদিও একই বুকের খাঁচার ভিতর ফুসফুস এবং হৃদপিন্ড একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে।
- বক্ষব্যাধি থেকে অনেক সময় হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। ফুসফুসের এমফাইসিমা নামে একটি রোগ রয়েছে, যা দেখা দিলে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয়।
- এমফাইসিমা রোগটি অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে ফুসফুসে তৈরি হতে থাকে এবং শেষ পর্যায়ে ফুসফুসের রক্তনালীগুলোর মধ্যে বাধা বাড়িয়ে দিতে থাকে। এই বাঁধা বৃদ্ধি শেষ পর্যায়ে হৃদযন্ত্রের ডান দিকের অংশের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে হার্ট ফেইলিউর সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত ধূমপানের কুফলে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে সঙ্গে এমফাইসিমা দেখা দিতে পারে। তাই ধূমপানের অভ্যাস আজই পরিত্যাগ করুন।
- জন্মগত কারণে যদি রক্তে আলফা ওয়ান এ্যান্টিট্রিপসিনের অভাব থাকে তাহলেও এমফাইসিমা দেখা দিতে পারে।
- তবে আমাদের দেশে ধূমপান এবং পরিবেশ দূষণের ফলেই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয়ে অথবা বহুদিনের অনিয়ন্ত্রিত হাঁপানির ফলে ফুসফুসে এমফাইসিমা দেখা দিয়ে থাকে।
- যদি কোনো ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস অথবা এমফাইসিমার রোগীর পায়ে পানি আসে, বুক ধড়ফড় করে, লিভার বড় হয়ে যায় বা পেটের ডান দিকে চাপ দিলে ব্যাথা করে, শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে রোগীর হৃদযন্ত্রের ডান দিকের অংশ বিকল হয়ে হার্ট ফেইলিউর দেখা দিয়েছে। শ্বাসযন্ত্রের রোগের কারণে হওয়া হার্ট ফেইলিউরকে করপালমোনেল বলা হয়ে থাকে।
- করপালমোনেল এমন একটা শ্বাসকষ্ট ঘটিত হৃদরোগ, যা সারাতে চিকিৎসকরা হিমশিম খান। সুতরাং যদি আপনি ধূমপায়ী হয়ে থাকেন তবে আজই ধূমপান ছেড়ে দিয়ে অধূমপায়ী হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করুন। হাঁপানির আজকাল খুবই উন্নত চিকিৎসা বেরিয়েছে। সেই উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে আপনার হাঁপানিকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মনে রাখবেন - রোগ প্রতিরোধ রোগের চিকিৎসার চেয়ে উত্তম।

## হার্ট ফেইলিউর কি উপায়ে হয়?

- হার্টের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা কমে গিয়ে
- হার্টের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে রক্ত পরিপূর্ণভাবে জমা না হতে পারায়
- হার্টের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত জমা হওয়ার ফলে।

তবে এই সমস্যার অনেকগুলোই বছরের পর বছর ধরে থাকতে পারে।

## হার্ট ফেইলিউর হলে কি হয়?

হার্ট ফেইলিউরের কিছু কিছু প্রাথমিক উপসর্গ প্রথমে দেখা দিতে পারে। তবে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না পেলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

হার্ট যখন পূর্ণশক্তিতে পাম্প করতে পারেনা তখন প্রতিটি হৃদস্পন্দন বা হার্ট বিটের সাথে স্বাভাবিকের তুলনায় কম রক্ত বের হবে এবং শরীরে প্রবাহিত হবে।

এরপর রক্ত শিরার ভিতর দিয়ে আবার হার্টে ফিরে আসে ফলে টিস্যুগুলো থেকে রক্ত ক্রমে জমা হয় শিরায়।

- যেহেতু হার্ট স্বাভাবিকের তুলনায় কম রক্ত পাম্প করে ফলে শিরায় রক্তের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে এক পর্যায়ে রক্ত শিরা থেকে আবার টিস্যুতে জমা হতে থাকবে। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে পানি বা তরল পদার্থ জমা হয়, যাকে বলে ইডিমা (Edema)।
- পায়ের আঙ্গুল, পায়ের পাতা, গোড়ালী, পা, পেটে এবং অন্যান্য টিস্যু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইডিমা হতে পারে।
- সব ইডিমাই হার্ট ফেইলিউরের কারণে হয় তা নয়। কেবলমাত্র ডাক্তারই এর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারেন।

- স্বাভাবিক অবস্থায় হার্টের বামপাশের প্রকোষ্ঠগুলোতে ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে সারা শরীরে পাম্পের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। তবে বাম নিলয় প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্প করতে না পারলে রক্ত পুনরায় ফুসফুসে ফিরে যায়। মাঝেমাঝে তরল পদার্থ রক্তনালী থেকে বেরিয়ে ফুসফুসের ফাঁকা জায়গায় জমা হতে থাকে। এ অবস্থাকে পালমোনারী ইডিমা বলা হয়ে থাকে।
- পালমোনারী ইডিমার ফলে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় এবং কান্ত হয়ে পড়ে।
- কিডনি শরীর থেকে কতটা সোডিয়াম/লবণ এবং পানি বের করে দেবে তা নির্ভর করে তার হার্ট কতটা ভালভাবে কাজ করছে।
- স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে সোডিয়াম প্রস্রাবের সার্থে নির্গত হয়, হার্ট ফেইলিউরের সময় তা শরীরে থেকে যায় এবং পানি ধরে রাখে।
- শরীরে অতিরিক্ত পানি জমে যাওয়া একটি সমস্যা, যার ফলে শরীরের ওজন যেমন বেড়ে যায় তেমনি শারীরিক অবস্থারও ক্রমশ অবনতি হতে থাকে।
- সবশেষে হার্ট ফেইলিউরের রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হতে হতে প্রচন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। হার্ট রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে করতে না পারায় শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদানের অভাবের কারণে এই অবস্থা হয়। এ কারণেই খাওয়ার পর রোগীর ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে, হাঁটতে গেলে দুর্বল লাগে এবং একটু পরিশ্রম করলেই শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়।

## হার্ট ফেইলিউরের উপসর্গগুলো কি ?

সবচেয়ে প্রধান এবং পরিচিত উপসর্গ হলো- শ্বাসকষ্ট। ফুসফুসে পানি জমে যাওয়া অথবা হার্টের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে এই শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে পরিশ্রম করলে শ্বাসকষ্ট হয় তবে রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে বিশ্রামে থাকা অবস্থায়ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। অনেক সময় রাতে শোয়া অবস্থায় হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। তখন মাথার নীচে একাধিক বালিশ দিয়ে উঁচু করে দিলে তবেই কিছুটা আরাম পাওয়া যায়।

- শরীরে, বিশেষ করে পায়ে এবং পেটে পানি জমে ফুলে যেতে পারে।
- দ্রুত শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া
- দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ হওয়া
- কাশি এবং অনেক সময় রক্তমিশ্রিত কফ হওয়া
- দ্রুত অথবা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন
- অসংলগ্ন চিন্তা, মাথা ঘোরানো বা মাথায় হালকাভাব অনুভব করা, ক্ষুধামন্দা এবং বমিবমি ভাব।

## হার্ট ফেইলিউর মানে কি হার্ট বিট বন্ধ হওয়া বা মারা যাওয়া ?

- হার্ট ফেইলিউর একটি দীর্ঘমেয়াদী, ক্রমাবনতিশীল রোগ এবং এই রোগ সাধারণত: পুরোপুরি নিরাময় হয় না।
- আশার কথা হলো এখন অনেক রকম চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে এই রোগের ক্রমাবনতিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব।
- হার্ট ফেইলিউর অনেক ক্ষেত্রে কোনরকম আগাম চিহ্ন বা উপসর্গ ছাড়াই দেখা দিতে পারে বা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যেতে পারে।
- প্রায় সব ধরনের হার্টের রোগ থেকেই হার্ট ফেইলিউর হতে পারে।
- তবে এর মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ এবং করোনারি আর্টারি ডিজিজ থেকে হার্ট অ্যাটাকের কারণে হার্ট ফেইলিউর এর ঘটনাই

সামগ্রিকভাবে বেশী ।

## চিকিৎসা

সাধারণত হার্ট ফেইলিউরের চিকিৎসা সম্ভব। সঠিক চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন জীবনধারায় কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউরের রোগী মোটামুটি ভাল বোধ করতে পারে।

হার্ট ফেইলিউর রোগীদের চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হলো -

- অবসাদ, শ্বাসকষ্ট এবং ইডিমা কমিয়ে আনা।
- শরীরের শক্তি বৃদ্ধি এবং ব্যায়াম করার মতো শরীরকে উপযুক্ত করতে সাহায্য করা।
- রোগের গতিকে থামিয়ে দেয়া বা মন্থর করা
- সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করা।

## হার্ট ফেইলিউরের রোগীর ব্যায়াম

- সাধারণত হার্ট ফেইলিউরের রোগীকে সচল বা কর্মতৎপর থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। কেননা এর মাধ্যমে সে সুস্থ ও আরও বেশী কর্মক্ষম থাকতে পারে।
- তবে একজন হার্টফেইলিউরের রোগীকে ব্যায়াম শুরু করতে হলে অবশ্যই তার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। অথবা ডাক্তারের উপস্থিতিতে স্ট্রেস টেস্ট বা ই.টি.টি. (ETT) করে পরিশ্রম করার ক্ষমতা যাচাই করে নেয়া উচিত।
- ব্যায়ামের মধ্যে এরোবিক্স, যেমন- হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো ইত্যাদি ধরনের ব্যায়ামই হার্ট ফেইলিউরের রোগীদের জন্য ভাল।

হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক নির্ণয়ে

# পরীক্ষা নিরীক্ষা

## হৃদরোগ নিরূপণের পরীক্ষা নিরীক্ষা

### কখন কোন পরীক্ষা করবেন?

- যদিও রোগীর উপসর্গ থেকে কারো করোনারি হার্ট ডিজিজ আছে কিনা তা অনুমান যায় তবুও রোগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন রোগ সনাক্ত করার জন্য এসব পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর উপসর্গ মেডিসিন বই এ লেখা বিবরণের সাথে মিলে না। যেসব পরীক্ষা করোনারি ব্লক জনিত অসুখ নির্ণয়ে করা হয় সেগুলো হল :
    - ই, সি, জি
    - এক্সারসাইজ ই,সি,জি (ETT)
    - ইকোকার্ডিওগ্রাম
    - করোনারি এনজিওগ্রাম
    - সিটি এনজিওগ্রাম ও
    - থ্যালিয়াম

উপরে বর্ণিত ৬টি টেস্ট ছাড়াও নিম্নলিখিত টেস্টগুলি করা হয় :

- ব্লড সুগার
- সিরাম কোলেস্টেরল
- সিরাম-ইউরিয়া / ক্রিয়েটিনিন
- বুকের এক্সরে

## ই সি জি (ECG)

- হৃদরোগ নির্ণয়ের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ও সনাতন পদ্ধতির নাম ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম বা ই,সি,জি ।
- গ্রাফ কাগজের ওপর হৃদপিন্ডের ইলেকট্রিক্যাল পরিবর্তন ধারণ করাকেই বলা হয় ই,সি,জি ।
- ই,সি,জি হার্ট অ্যাটাক, অ্যানজাইনা, হৃৎপিন্ডের অনিয়মিত গতি, হৃৎপিন্ডের মাংসপেশী পুরু হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নির্ণয় করতে সক্ষম । করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ে যদিও ই,সি,জি একটি সহজ পদ্ধতি কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও অনেক ।
- যাদের ইসকেমিয়া বা করোনারি হার্ট ডিজিজ আছে তাদের দুই তৃতীয়াংশের ই,সি,জিতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সনাক্ত করা যায় । বাকী এক তৃতীয়াংশের রোগ থাকা সত্ত্বেও ই,সি,জি নরমাল বা স্বাভাবিক থাকে । তাই ই,সি,জি নরমাল হলেই হৃদরোগ নেই এ ধারণা ঠিক নয় । রোগীর ইতিহাস এবং উপসর্গ রোগ নির্ণয়ে সহায়ক । আবার এর উল্টোটাও হতে পারে ।
- অনেক সময় দেখা গেছে রোগীর ই,সি,জি অস্বাভাবিক কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেল তার কোন ইসকেমিয়া নেই । সাধারণত এটা মেয়েদের বেলায় বেশী দেখা যায় । তবে ডাক্তারের যদি সন্দেহ হয় তবে অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিত । যাদের হৃদরোগ আছে তাদের মাঝে মাঝে ই,সি,জি করা উচিত ।
- এছাড়াও যদি কখনো বুকের ব্যথা ৫ মিনিট বা তার বেশী সময় স্থায়ী হয় তখন আবারও একটি ই,সি,জি করা উচিত ।

## এক্সারসাইজ ই সি জি

- এক্সারসাইজ ইসিজি কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় স্ট্রেস টেস্ট বা ইটিটি। ইসকেমিয়া নির্ণয়ে এটি একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা।
- দেখা গেছে যাদের হৃৎপিন্ডে ব্লক আছে তারা যখন পরিশ্রম করে তখন তাদের বুক ব্যথা হয় এবং সে সময়ই শুধু ইসিজিতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সনাক্ত করা যায়, কিন্তু রোগী যখন বিশ্রাম করে তখন আবার ইসিজি নরমাল হয়ে যায়। ইসিজি'র উপর পরিশ্রমের এ ধরনের প্রভাব সনাক্ত করার জন্য স্ট্রেস টেস্ট করা হয়।
- এই পরীক্ষায় রোগীর বুকে ইসিজি লিড ফিক্স করে তাকে একটি কম্পিউটার চালিত প্লাটফর্মে হাঁটানো হয়। প্রতি ৩ মিনিট পর পর এই প্লাটফর্মটির গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোগী যতক্ষণ হাঁটবে এবং তার পরবর্তী ৬ থেকে ১০ মিনিট অনবরত ইসিজি মনিটরিং করা হয়। এই মনিটরিং এ ধরা পড়ে পরিশ্রম করলে ইসিজিতে কোনো ইসকেমিক পরিবর্তন আসে কিনা।
- যাদের এই টেস্ট পজিটিভ হয় তাদের ৯০% রোগীর করোনারি ধমনীতে ব্লক আছে। যদি কোন পুরুষের এই এক্সারসাইজ টেস্ট পজিটিভ হয় তবে ধরেই নেয়া হয় তার করোনারি হার্ট ডিজিজ আছে, কিন্তু মেয়েদের বেলায় অনেক সময় দেখা গেছে যাদের টেস্ট পজিটিভ তাদেরও কোনো ইসকেমিয়া নেই। এটাকে বলা হয় ফলস পজিটিভ টেস্ট।

## ইকোকার্ডিওগ্রাফি (**Echocardiography**)

- শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে হৃদরোগ নিরূপণের আধুনিক প্রযুক্তিকে বলা হয় ইকোকার্ডিওগ্রাফি। সহজভাবে বলা যায়, হৃদপিন্ডের আলট্রাসনোগ্রাফির আরেক নামই ইকোকার্ডিওগ্রাফি।
- এই পদ্ধতিতে ২.৫ থেকে ৭.৫ মেগাহার্টজ ট্রান্সডিউসার দিয়ে টেলিভিশনের স্ক্রীনের মতো পর্দায় হৃৎপিন্ডের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। হার্ট অ্যাটাকের পর হার্টের যে দেয়ালে ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক হয়, ইকোতে সে দেয়াল হয় একদম নড়াচড়া করে না অথবা অন্য দেয়াল থেকে অপেক্ষাকৃত কম নড়াচড়া করে।
- হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও সম্প্রসারণ ক্ষমতা দুটোই নির্ণয় করা যায়। হৃদরোগীদের জন্য হৃৎপিন্ডের সিস্টোলিক ফাংশন বা সংকোচন ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে সহজভাবে বলা হয় ইজেকশন ফ্র্যাকশন (EF)। একজন সাধারণ মানুষের ইজেকশন ফ্র্যাকশন (EF) থাকে ৫০% এর উপরে। যদি কোন হৃদরোগীর EF ৫০% এর নীচে নেমে যায় তবে বুঝতে হবে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর সংকোচন ক্ষমতা কমে গেছে। যদি EF ২৫% এর কম হয় তবে বুঝতে হবে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর সংকোচন ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে গেছে।
- হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের ভাল্বের কার্যাবলী স্বাভাবিক আছে কিনা, অথবা হৃৎপিন্ডের ভেতর কোন জমাট রক্ত আছে কিনা তা দেখা যায় ইকোতে। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর ইকোকার্ডিওগ্রাম সবসময়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন সনাক্ত করতে পারে। তবে হার্ট অ্যাটাক না হওয়া পর্যন্ত অ্যানজাইনার রোগীদের ইকোকার্ডিগ্রাম নরমাল থাকতে পারে।
- ইদানিং আধুনিক প্রযুক্তিতে ডোপামিন বা ডোবুটামিন জাতীয় ঔষধ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করিয়ে হৃদপিন্ডের গতি বাড়িয়ে ইসকেমিয়া নির্ণয় করা যায়। একে বলা হয় স্ট্রেস ইকো।
- এখন ডপলার ফিজিক্স প্রয়োগ করে হৃৎপিন্ডের প্রসারণ ক্ষমতাও মাপা যায়। কালার ডপলার দিয়ে হৃৎপিন্ডের ভেতরের রক্ত চলাচল পর্যন্ত দেখা যায়। হৃৎপিন্ডের যে কোনো ভাল্ব বা কপাটিকার সামান্যতম লিক বা ত্রুটিও কালার ডপলারে ধরা পড়ে।

## করোনারি এনজিওগ্রাম (CAG)

- সরাসরি করোনারি ধমনীর ব্লকের চিত্র নেয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় করোনারি এনজিওগ্রাম। এই পদ্ধতিতে ইসকেমিয়া নির্ণয় করা যায় শতকরা ১০০% নিশ্চিতভাবে।
- করোনারি এনজিওগ্রামে একটি ছোট্ট ক্যাথেটার (প্লাস্টিকের নল) মহাধমনীতে প্রবেশ করিয়ে ধমনীতে কতোটা ব্লক তা নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষা করার সময় রোগীকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন পড়ে না। হাতে অথবা উরুর উপরে লোকাল এনেস্থেসিয়া দিয়ে এই টেস্ট করা হয়। ইনজেকশন দেয়া ছাড়া রোগী কোন ব্যথা পায় না। মহাধমনী বা হৃৎপিন্ডে ক্যাথেটার নড়াচড়া করার সময় বিন্দুমাত্র ব্যথা অনুভূত হয় না। রোগী আর ডাক্তার কথা বলতে বলতে এ টেস্ট করা যায়। সাধারণত ১০ মিনিট থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে এই টেস্ট শেষ হয়ে যায়।
- এই পদ্ধতিতে ক্যাথেটারের মধ্য দিয়ে করোনারি ধমনীর শুরুতে বা গোড়াতে আয়োডিন ঘটিত যৌগ ইনজেকশন দিয়ে সিনে ফিল্ম বা ভিডিও দিয়ে বিভিন্ন ছবি নেয়া হয়। এই ছবিগুলোতে করোনারি ধমনীগুলোর ব্লক বা প্রতিবন্ধকতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কয়টি আর্টারি ব্লক বা ব্লক কতোটা মারাত্মক তা সব স্পষ্ট করে বলা যায় এনজিওগ্রামের ছবি দেখে।
- চল্লিশ বছর বয়সের পর করোনারি ধমনীতে ছোটখাট ব্লক থাকা স্বাভাবিক।
- যদি কোন ধমনী ৫০% এর বেশি চেপে যায় তবে তাকে সিগনিফিকান্ট ব্লক বা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। যদি কোন ধমনী ৭০% ব্লক হয় তবে রোগীর চিকিৎসা দরকার।
- এই টেস্ট করার পর ৪ থেকে ৬ ঘন্টা বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। তারপর সে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারে।
- এ পরীক্ষার সময় কোন কাটাছেঁড়া করা হয় না, তাই সেলাই দেয়ার প্রশ্ন উঠে না।
- এনজিওগ্রামের জটিলতা নগণ্য।

## সিটি এনজিওগ্রাম (CT Angiogram)

- সরাসরি করোনারি ধমনীগুলোর চিত্র নেয়ার জন্য প্রথাসিদ্ধ করোনারি এনজিওগ্রামের পাশাপাশি ইদানিং নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে করোনারি সিটি এনজিওগ্রাম। হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাট রক্ত পরীক্ষার মতো CT স্ক্যান মেশিনের টেবিলে শুয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে হার্টের করোনারি ধমনীর বিশদ চিত্র নিরূপণ করা সম্ভব বলে সারা বিশ্বে সম্প্রতি এর প্রচলন, জনপ্রিয়তা ও প্রসার দিন দিন বেড়ে চলেছে।
- করোনারি ধমনীর অবস্থান চিত্র, ভেতরের ব্লক বা সরু হয়ে যাবার প্রায় নির্ভুল বিবরণ বা রক্তনালীর দেয়ালে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ - এসব দ্রুত নিরূপণের জন্যে আধুনিক করোনারি সিটি এনজিওগ্রামের বিকল্প নেই বললেই চলে।
- নির্ভুলভাবে করোনারি ধমনীর রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথা মাফিক করোনারি এনজিওগ্রাম ও করোনারি সিটি এনজিওগ্রামের ভিতর পার্থক্য খুবই কম।

## সিটি এনজিওগ্রাম কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে ?

- যে সমস্ত রোগীর হার্ট ডিজিজ হওয়ার রিস্ক ফ্যাক্টর যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ বা হাইপারটেনশন, উচ্চমাত্রায় কোলেস্টোরল বা পারিবারিক হার্ট ডিজিজের ইতিহাস আছে, যারা প্রচুর ধূমপান করেন বা করতেন, যারা বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন- কিন্তু ডাক্তারের দৃষ্টিতে সেই বুকের ব্যথা হার্টের কারণে নয়, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার জন্য সিটি এনজিওগ্রাম করা খুবই সহজ একটি উপায়।
- ই টি টি'র সুনির্দিষ্ট ফলাফল না হলে।
- জরুরী ভিত্তিতে Streptokinase দেওয়ার পর ফলাফল পরীক্ষা করা।
- হার্টের ধমনীর জন্মগত ত্রুটি পরীক্ষা করা।
- স্টেন্ট বা 'রিং' এর ভিতর রোগের বিস্তৃতি পরীক্ষা করা বা রিস্টেনোসিসের মাত্রা নির্ণয়।
- করোনারি বাইপাস অপারেশন করেছেন এমন রোগী যে কোন সময় তার গ্রাফ্টগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা দেখবার জন্য এই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারেন।
- হার্টের অন্যান্য অপারেশনের পূর্বে রোগীর ধমনী পরীক্ষা করা।

## সিটি এনজিওগ্রাম করার পূর্বশর্ত

- রোগীর রক্তের ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিক মাত্রার ভিতর থাকতে হবে।
- পরীক্ষা করার সময় হৃৎস্পন্দন বা হার্ট বিট ৬০-৬৫/ মিনিটের ভিতর থাকা বাঞ্ছনীয়।
- CT করোনারি এনজিওগ্রাম করার জন্য সময় লাগে ১০-১৫ মিনিট এবং এ সময়ে ২০ সেকেন্ডের জন্য শ্বাস বন্ধ রাখবার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলাদের CT এনজিওগ্রাম করা যাবে না।
- এই পদ্ধতিতে শিরার ভিতর এক ধরনের আয়োডিন সমৃদ্ধ তরল ইনজেকশন দেয়া হয় তাই যাদের আয়োডিন এলার্জি রয়েছে তারা এই পরীক্ষা করতে পারবেন না।

## CT করোনারি এনজিওগ্রাম -এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

- এখানে মনে রাখতে হবে যে, CT এনজিওগ্রাম একটি রোগ নির্ণয়ী পরীক্ষা। এটি কোন চিকিৎসা প্রদানকারী পদ্ধতি নয়। পরীক্ষা শেষে ধমনীর চিত্রগুলোকে একটি শক্তিশালী কম্পিউটারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়।
- CT এনজিওগ্রাম করোনারি ধমনীতে কোন ব্লক থাকলে তার জন্য সঠিক চিকিৎসা যেমন বেলুন ফুলিয়ে স্টেন্ট বা রিং পরিয়ে দেয়া - বা অন্য আরো পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার কোন সুযোগ নেই। রোগ নির্ণয়ের পর এসব ক্ষেত্রে অবশ্য প্রথাসিদ্ধ করোনারি এনজিওগ্রামে যেতে হবে।
- যে সমস্ত মানুষ তাদের করোনারি ধমনীর অবস্থা জেনে নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন তাদের জন্য সময় এবং কষ্ট দুটোই অনেক কম এই পদ্ধতিতে।
- এই পদ্ধতিতে ধমনীর চিত্র তোলার সময় এতে ক্যালসিয়াম এর বিস্তৃতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। এই ক্যালসিয়াম এর মাত্রা ধমনীতে রোগের আগাম বার্তা দেয় কিন্তু প্রথাসিদ্ধ ক্যাথেটার এনজিওগ্রামে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ধরা পড়ে না।

## থ্যালিয়াম বা মিবি স্ক্যান

- নিউক্লিয়ার কার্ডিওলজি এখন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ সনাক্ত-করণের একটি জনপ্রিয় পরীক্ষা ।
- থ্যালিয়াম ২০১ অথবা সাসাটামিবি (মিথক্সি আইসোবুটাইল আইসোনাইট্রাইল) ইনজেকশন দিয়ে হৃৎপিন্ডের ধমনীর রক্ত প্রবাহে কোন বাঁধা আছে কিনা তা নির্ণয় করা যায় ।
- বেলুন চিকিৎসা এবং বাইপাস অপারেশন করার পর এই পরীক্ষা করে চিকিৎসা ফলাফল নির্ণয় করা যায় ।
- এটি এক্সারসাইজ ইসিজি'র মতোই । রোগী যখন এক্সারসাইজ টেস্ট করতে থাকে তখন তাকে থ্যালিয়াম অথবা মিবি ইনজেকশন দেয়া হয় । ইনজেকশন দেয়ার পর গামা ক্যামেরা দিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে হৃৎপিন্ডের ছবি নেয়া হয় । রক্তপ্রবাহে বাঁধা থাকলে এই টেস্টে ধরা পড়ে ।
- করোনারি ব্লক নির্ণয়ে এই টেস্টের সফলতা প্রায় ৯০-৯৫% ।
- যাদের হৃৎপিন্ডের কার্যক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে গেছে তাদের বাইপাস অপারেশন অথবা বেলুন এনজিওপ্লাস্টি করে কোন লাভ হবে কিনা তাও এই স্ক্যান করে বুঝা যায় ।

## স্ট্রোক নির্ণয়ে পরীক্ষা কি ?

- মস্তিষ্কের CT স্ক্যান
- মস্তিষ্কের MRI

## অন্যান্য পরীক্ষা

- যে সকল রোগী এ্যাসপিরিন এবং কপিডোগ্রেল জাতীয় ঔষধ সেবন করে থাকেন তাদের বছরে কমপক্ষে দুইবার রক্ত পরীক্ষা করে রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং অনুচক্রিকার মাত্রা নির্ণয় করা উচিত। কারণ এ সকল ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্যাসট্রিক ইরিটেশন হয়ে পাকস্থলিতে রক্তক্ষরণ হয় এবং রক্ত অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে যায়।
- এছাড়াও প্রয়োজনবোধে X-ray Chest, ব্লাড ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি পরীক্ষা করা উচিত।
- লিপিড প্রোফাইল - হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে লিপিড প্রোফাইল নামক পরীক্ষা করে বিভিন্ন প্রকার কোলেস্টেরলের মাত্রা নির্ণয় করা হয়। লিপিড প্রোফাইল এর মধ্যে চার ধরনের কোলেস্টোরল আছে যথাঃ (১) টোটাল কোলেস্টোরল (২) ট্রাইগ্লিসারাইড (৩) হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন এবং (৪) লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন। একমাত্র হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন ছাড়া বাকী ৩টি কোলেস্টেরলের মাত্রা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তবে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশী থাকে।
- কোলেস্টেরল পরীক্ষার সঙ্গে লিভার ফাংশন টেস্টও করা উচিত। কারণ রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো লিভার ফাংশন ঠিক না থাকলে প্রয়োগ করা যায় না আবার অনেক সময় উক্ত ঔষধ প্রয়োগে লিভার ফাংশন ব্যাহত হতে পারে এবং তখন উক্ত ঔষধ বন্ধ করা হয়।
- হৃদরোগীদের বছরে কমপক্ষে একবার রক্তের কোলেস্টেরল এবং লিভার ফাংশন টেস্ট করা উচিত। তবে প্রয়োজনে একাধিকবার টেস্ট করার দরকার হতে পারে।

# হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধ

## হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের উদ্দেশ্য

- যারা হার্ট অ্যাটাকের কম ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদের ঝুঁকি বাড়তে না দেয়া আর যারা বেশী ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদের ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে আনা।
- সুস্থ থাকার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী দরকার মানুষকে সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা। যেমন :
  - ধূমপান বর্জন করা।
  - সুষম খাদ্য গ্রহণ।
  - দৈনিক কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলা।
  - বিএমআই ২৫ কেজি/মিটার$^২$ নিচে রাখা এবং ওবেসিটি এড়ানো।
  - রক্তচাপ ১৪০/৯০ মিলিমিটার মারকারি এর নিচে রাখা।
  - রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ৫ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১৯০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা।
  - এলডিএল কোলেস্টেরল ৩ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১১৫ মিলিগ্রামের নিচে রাখা।
  - রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৬ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১১০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা।
- অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ করে যারা ইতোমধ্যে হার্ট অ্যাটাক বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের রিস্কফ্যাক্টরগুলোকে জোড়ালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন :
  - রক্তচাপ ১৩০/৮০ মিলিমিটার মারকারি নিচে রাখা।
  - টোটাল কোলেস্টেরল পরিমাণ ৪.৫ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১৭৫ মিলিগ্রামের নিচে রাখা।
  - এলডিএল কোলেস্টেরল ২.৫ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা।
  - অভুক্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৬ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১১০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা এবং $HBA_1C$ শতকরা ৬.৫ ভাগ নিচে রাখা।
- অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ করে যারা ইতোমধ্যে হার্ট অ্যাটাক বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

## দৈনন্দিন চিকিৎসা কার্যক্রমে হৃদরোগ প্রতিরোধকল্পে কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

- এটা আজ প্রতিষ্ঠিত যে, হার্ট অ্যাটাক অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। সেই সাথে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় সামগ্রিক ব্যয়ের ক্ষেত্রেও হৃদরোগের প্রভাব অন্যতম ভূমিকা রাখছে।
- করোনারি হার্ট ডিজিজের মূল কারণ অ্যাথরোস্কেরোসিস তৈরি হয় অনেক বছর ধরে আস্তে আস্তে এবং এর উপসর্গগুলো প্রকাশ পায় যখন এই অ্যাথরোস্কেরোসিস প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়।
- হার্ট অ্যাটাক হয় হঠাৎ করে কিন্তু এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে অনেক আগে থেকে। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন দুই-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় কোন রকম চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার আগেই।
- মানুষ বেশীরভাগ সময়ই বুঝে উঠতে পারে না তার ভিতরে কি সমস্যা হচ্ছে ফলে চিকিৎসা নিতে দেরি করে ফেলে। সুতরাং অনেক আধুনিক এবং উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও তা প্রয়োগের সুযোগ অনেক সময়ই পাওয়া যায়না।
- অধিকাংশ হার্ট অ্যাটাকের ঘটনাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা এবং পরিবর্তনশীল শারীরিক এবং জৈবিক ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে কমিয়ে আনতে পারলে হৃদরোগজনিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুর হার বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বিশেষ করে অতিরিক্ত ঝুঁকি সম্পন্ন রোগীদের বেলায়।

## হৃদরোগ প্রতিরোধ কর্মসূচীতে কোন্ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে

- ইতোমধ্যে যারা করোনারি হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছেন।
- যাদের কোন হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ দেখা দেয়নি কিন্তু হৃদরোগের অত্যধিক ঝুঁকির ভেতরে আছেন। যেমন :
- অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর বিদ্যমান থাকার কারণে যাদের সামগ্রিক হৃদরোগের ঝুঁকির পরিমাণ বেড়ে গেছে। (আগামী ১০ বছরে হার্ট অ্যাটাক জনিত মৃত্যুর ঝুঁকি শতকরা ৫ অথবা তার বেশি)
- যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিস অথবা টাইপ-১ ডায়াবেটিসের সাথে মাইক্রোএলবুমিনোরিয়ায় আক্রান্ত।
- যাদের কোন একটি রিস্ক ফ্যাক্টর অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেছে যার কারণে কোন বিশেষ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- যাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এথোরোস্কেরোসিস জনিত হৃদরোগে ভুগছেন বা অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে আছেন।

## একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার (একজন সুস্থ মানুষের গুণাবলি - ০ ৩ ৫ ১৪০ ৫ ৩ ০)

| | |
|---|---|
| ০ | অধূমপায়ী |
| ৩ | প্রতিদিন ৩ কিলোমিটার হাঁটা অথবা কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম -এর অভ্যাস। |
| ৫ | প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে অর্থাৎ কমপক্ষে ৫ পরিবেশনার সমান শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস। |
| ১৪০ | সিসটোলিক রক্তচাপ ১৪০ এর নিচে। |
| ৫ | রক্তে কোলস্টেরলের পরিমাণ ৫ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১৯০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা। |
| ৩ | এলডিএল কোলস্টেরল ২.৫ মিলি মোল/ লিটার বা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা। |

| | |
|---|---|
| ০ | অতিরিক্ত ওজন ও ডায়াবেটিস থেকে দুরে থাকা । |

## কখন হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি নিরূপণ করবেন ?

- যখন রোগী নিজে থেকে তার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।
- দৈনন্দিন চিকিৎসা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে
- রোগী যদি মধ্যবয়সী ধূমপায়ী হন।
- রোগী যদি মোটা, বিশেষ করে পেট মোটা হন।
- রোগীর যদি নিম্নলিখিত এক বা একাধিক রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে।

  যেমন :
  - উচ্চ রক্তচাপ
  - রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা বা ডিসলিপিডেমিয়া।
  - ডায়াবেটিস
- যাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এথেরোস্ক্লেরোসিস জনিত হার্ট অ্যাটাকে ভুগছেন বা অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে আছেন।
- যাদের মধ্যে কিছু হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ বিদ্যমান।

## হৃদরোগের ঝুঁকি নিরূপণে কোন উপাদানগুলি ভূমিকা রাখে?

- রোগের ইতিহাস।
- রোগীর শারীরিক পরীক্ষা।
- ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা।
- রেষ্টিং ইসিজি এবং এক্সারসাইজ ইসিজি।
- ইকোকার্ডিওগ্রাম (বিশেষত উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে)।
- যাদের পরিবারের কেউ অপরিণত বয়সে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে উচ্চ সংবেধনশীল সিআরপি, লিপোপ্রোটিন-এ, এবং ফিব্রিনোজেন এগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- অকাল হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত নিকটাত্মীয় অথবা যে পরিবারের সদস্যদের উত্তরাধিকার সূত্রে ডিসলিপিডেমিয়া আছে বা পারিবারিক সূত্রে রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল আছে তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং এই সমস্ত লোকদের নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হৃদরোগে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি নিরূপন করা দরকার।

## হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে জীবনধারা পরিবর্তন কেন জরুরী?

- ১৯৯২ সালে এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল যে, সারাবিশ্বে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগ মানুষ অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি লোক শুধুমাত্র ধুমপান বা তামাক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের কারণে মৃত্যুবরণ করবে।
- আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হার্ট অ্যাটাকের কারণও তামাক জাতীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার।
- তামাক বা ধূমপানের নিয়ন্ত্রণ হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে বহুমূখী পদক্ষেপের মধ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ এখন অতীতের তুলনায় অনেক বেশী বাস্ত ব ধারণা।
- পঞ্চাশটি দেশে পরিচালিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমীক্ষা ইন্টার হার্ট স্টাডির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে, শতকরা ৯০ ভাগ হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী উপরোল্লেখিত নয়টি সুপরিচিত রিস্ক ফ্যাক্টরে। যার অধিকাংশই মানুষের জীবনধারার সাথে সম্পর্কিত।
- উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা যদি শতকরা ১ ভাগ কমানো যায় অথবা ডায়াস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার ১ মি.মি. মারকারি কমানো যায় তবে হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি শতকরা ২-৩ ভাগ কমে যাবে। আর একজন ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিলে তার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা নেমে আসে অর্ধেকে।
- নয়টি রিস্ক ফ্যাক্টর যদি জীবনধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় তবে আমরা শতকরা ৯০ ভাগ হৃদরোগ প্রতিরোধে সক্ষম হব। আর বাকি ১০ ভাগের জন্য প্রয়োজন হবে চিকিৎসার। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে জীবনধারা পরিবর্তন অপরিহার্য।

## কেন হার্ট অ্যাটাকের সামগ্রিক ঝুঁকি নিরূপণে গুরুত্ব দেয়া হয়?

- সাধারণত অনেকগুলো রিস্কফ্যাক্টর মিলে এথেরোস্কেরোসিস জনিত হৃদরোগ হয়ে থাকে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম, অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং সামাজিক চাপ ও মানসিক দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।
- এই সমস্ত রিস্কফ্যাক্টরগুলো একত্রে অনেক সময় বহুগুণ বেশি ভূমিকা রাখে।
- উদ্দেশ্য হতে হবে সামগ্রিক ঝূঁকি নিয়ন্ত্রণ।
- যদি কোন একক রিস্ক ফ্যাক্টর কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়, অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামগ্রিক ঝুঁকির মাত্রা কমানো সম্ভব।
- এমনকি অল্প পরিমাণে প্রধান ঝুঁকি সমুহের সামান্য নিয়ন্ত্রণই হৃদরোগের মৃত্যুর হারকে কমাতে পারে।

## জীবনধারা পরিবর্তনে কিছু টিপস্

- রোগীর সাথে সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- রোগীকে বোঝাতে হবে যে, রোগ এবং জীবনধারার সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে।
- জীবনধারা পরিবর্তনের জন্য রোগীর থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে।
- রোগীকে রিস্ক ফ্যাক্টর নিরূপণে সাহায্য করতে হবে।
- রোগীর জীবনধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধাগুলো দূর করতে হবে।
- জীবনধারা পরিবর্তনের ছক তৈরিতে রোগীকে সাহায্য করতে হবে।
- জীবনধারা পরিবর্তনে বাস্তবধর্মী এবং উৎসাহী হতে হবে।
- জীবনধারা পরিবর্তনে রোগীর প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে হবে।
- পরিবর্তনের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
- প্রয়োজনে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য নিতে হবে।

## জীবনধারা পরিবর্তন করা মানুষের জন্য কঠিন কেন ?

- আর্থ-সামাজিক অবস্থা - নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থা যেমন: অশিক্ষা স্বল্প আয় ইত্যাদি জীবনধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা আনে ।
- সামাজিক একাকীত্ব - যারা একা বসবাস করে সাধারণত তাদের জীবনধারা অস্বাস্থ্যকর হয় ।
- স্ট্রেচ - কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে কাজের চাপ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে একটি বড় ধরনের অন্তরায় ।
- ঋণাত্মক আবেগ - বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা, শত্রুতা ইত্যাদি জীবনধারা পরিবর্তনে বাঁধার সৃষ্টি করে ।
- জটিল এবং অস্পষ্ট উপদেশ ।

উপর্যুক্ত ফ্যাক্টরগুলো চিকিৎসকের সচেতনতা বৃদ্ধি ও জীবনধারা পরিবর্তনে রোগীকে সহায়তা করতে পারে ।

## জীবনধারা পরিবর্তনের পাশাপাশি হার্টের সুস্থতার জন্য ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন কখন হয় ?

- যারা হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন অথবা যাদের আগামী ১০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ১০ ভাগ বা তার বেশি তারা সকলেই এ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডোগ্রেল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন ।
- যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে অথবা যারা হার্ট ফেইলিউরে আক্রান্ত তারা বিটা ব্লকার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করবেন ।
- যারা হার্ট ফেইলিউরের রোগী এবং যাদের ডায়াবেটিস/উচ্চ রক্তচাপ আছে অথবা নেপ্রোপ্যাথি আছে তারা এসি ইনহিবিটর ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন ।
- যাদের এ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে অথবা যাদের রক্ত জমাট বাধার আশংকা আছে তারা নিয়মিত রক্ত তরলিকারক বা এন্টিকোয়াগুলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন ।

## হৃদরোগ সংক্রান্ত কিছু তথ্য

- বয়স্ক মানুষ যারা নিয়মিত চা অথবা কফি পানে অভ্যস্ত তাদের হৃদরোগজনিত মৃত্যুর আশংকা কম। এর সম্ভাব্য কারণ হিসাবে গবেষকরা ক্যাফেইনকেই দায়ী করেছেন। বয়স্কদের মধ্যে খাবার পরবর্তী হাইপো-টেনশন লক্ষ্য করা যায় খুব বেশী। ক্যাফেইন এই খাবার-পরবর্তী হাইপো-টেনশন জনিত হৃদরোগের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়।
- অবসর নেয়ার ১০ বছর আগে মাসিক আয় যদি অবসর নেয়া পর্যন্ত না বাড়ে অথবা অপরিবর্তিত থাকে তবে অবসর নেয়ার পর তাদের হৃদরোগের আশংকা বেড়ে যায়। গবেষকরা আরও দেখিয়েছেন যে, যাদের আশেপাশে বসবাসকারী লোকজন কম সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন তাদের মধ্যে হৃদরোগ এবং হৃদরোগজনিত মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।
- চায়ের সঙ্গে দুধ মেশালে চায়ের রক্তনালী সুরক্ষিত রাখার উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। জার্মান গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, দুধ ছাড়া চা খেলে এন্ডোথেলিয়ামের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায় কিন্তু দুধ মেশালে এ ধরনের কার্যক্রম দেখা যায়না।
- নিয়মিত স্বল্পকালীন দিবা নিদ্রা হৃদরোগজনিত মৃত্যুর হার কমাতে সক্ষম। মেডিটেরিনিয়ান এবং ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোতে দিবা নিদ্রার অভ্যাস বেশি। সমীক্ষায় দেখা যায়, তাদের মধ্যে হৃদরোগজনিত মৃত্যুর হার কম।
- কর্কশ শব্দে বেজে ওঠা সাইরেন ও ক্রমাগত হর্নের শব্দ হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। যারা ৫০ ডেসিবেলের রোড নয়েজে শিকার হন তাদের সবার ক্ষেত্রে এমনটি দেখা গেছে। একদল সুইডিশ বিজ্ঞানী তাদের গবেষণার পর এ তথ্য জানিয়েছেন।